দেশ কাল মানুষের আজ কাল পরশু

নাগরিক

তৃতীয় বর্ষ ❖ ১২ সংখ্যা ❖ ১৭ নভেম্বর ২০২৬



➲ এই সংখ্যায় থাকছে

প্রসঙ্গ : জাতীয়তাবাদ ও ধর্ম

■ উগ্র জাতীয়তাবাদ সম্পর্কে কবিগুরুর সমালোচনা — শুভাশিস মজুমদার — ৩

■ বিভেদ সৃষ্টি ও ঐক্য স্থাপনে ধর্মের ভূমিকা — মজিবুর রহমান — ৬

■ বিভেদের বিষবৃক্ষ ও সমন্বয়ের পথ — মনীষা বন্দ্যোপাধ্যায় — ৮

ফিরে দেখা

কলকাতা বেতারের শতবর্ষ : প্রথম যুগের চ্যালেঞ্জ — ভবেশ দাশ — ১১

ইতিহাস

■ বিপ্লবী ভগৎ সিং - এর দৃষ্টিতে দুই নেতা জওহরলাল নেহরু ও সুভাষ চন্দ্র বসু — অভিনব চক্রবর্তী — ১৬

■ ইতিহাসের প্রেক্ষিতে বইয়ের ওপর আক্রমণ — শঙ্কর ঘোষ — ১৮

আন্তর্জাতিক

■ মার্কিন মধ্যবর্তী নির্বাচনে ট্রাম্পের জনপ্রিয়তায় ধ্বস — সৌর বসু — ১৯

■ ইজরায়েলের নির্বাচন : আগ্রাসী নেতানিয়াহু পরাস্ত — মনিরুল হক — ২১

ভ্রমণ

■ সুমাত্রা - যবদ্বীপের পথে বিপথে — সৌর বসু — ২২

দেশের খবর

■ ভোটার তালিকায় নজিরবিহীন অনিশ্চয়তা : Form 7– Adjudication এবং নির্বাচন কমিশনের দায়বদ্ধতা — পার্থ প্রতিম বিশ্বাস — ২৬

■ গণতন্ত্র ও অহিংসার রাজনীতি নিয়ে হায়দ্রাবাদে — সরব রাহুল — ২৮

■ নেহা বোরা ও পিস বন্ড স্বাক্ষর — ২৯

■ অরুণাচলে চলমান বাঁধ বিরোধী আন্দোলন — পি এস মুখার্জি — ২৯

রাজ্য সংবাদ

■ প্রিয়রঞ্জন দাশমুন্সির মূর্তির আবরণ উন্মোচন — দেবাশিস মজুমদার — ৩০

■ পুরুলিয়ায় বিশাল আদিবাসী সমাবেশ — অনিতেশ চক্রবর্তী — ৩১

■ ছট পুজো কী? — জহর সরকার — ৩১

বিশেষ ক্রোড়পত্র

● বন্ধুতার পাতা, সংকলক শুভেন্দু দাশগুপ্ত (পত্রিকার শেষ চারপাতা)

সম্পাদক

শান্তনু দত্ত চৌধুরী

সম্পাদকমণ্ডলী - সৌর বসু, মিলন দত্ত, ড. সিদ্ধার্থ সেন, অমিতাভ সিনহা, মনিরুল হক, শুভাশিস মজুমদার।

সৌর বসু কর্তৃক সীমান্ত পল্লী, শান্তিনিকেতন, বীরভূম, পিন-৭৩১২৩৫ থেকে প্রকাশিত।

ই-মেল- nagorik0240@gmail.com ♦ ফোন- 80178 04019 / 94340 22512 ♦ ওয়েবসাইট- nagorik.co.in

➲ সম্পাদকীয়

আমাদের রাজ্য কোন পথে চলেছে

রাজ্যে ভারতীয় জনতা পার্টির সরকার ক্ষমতায় এসেছে গত মে মাসের চার তারিখ। অর্থাৎ এই সরকারের বয়স ঠিক ছয় মাস। কোনও নতুন সরকারের পক্ষে এই স্বল্প সময়ের মধ্যে সব সমস্যার সমাধান করা সম্ভব নয় এই বিষয়টি সকলেই বোঝেন। কিন্তু সরকার কী করতে চাইছেন সে সম্পর্কে তাদের বিভিন্ন ক্ষেত্রে নীতি কী সে বিষয়টি এখনও পরিস্কার নয়। তবে ক্ষমতায় আসার পর থেকেই তাঁরা রাজ্যে শিল্প স্থাপনের জন্য যাতে শিল্পপতিরা বিনিয়োগ করেন, তার জন্য প্রচেষ্টা চালাচ্ছেন বলে শোনা যাচ্ছে।

কিন্তু রাজ্যের পরিস্থিতি কি বিনিয়োগের পক্ষে অনুকূল ? সম্প্রতি রাজ্যের অর্থমন্ত্রী স্বপন দাশগুপ্ত রাজধানীতে বলেছেন রাজ্যে তোলাবাজি এক বড় সমস্যা । কিছু লোকের তোলাবাজি অভ্যাসে পরিণত হয়েছে । এরকম তোলাবাজি ও গুন্ডামি যদি চলতে থাকে তাহলে রাজ্যবাসীর সরকারের ওপর আস্থা থাকবেনা । রাজ্যে অনুকূল পরিস্থিতি না থাকলে বিনিয়োগও আসবেনা। বিজেপি দলের প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার বলেছেন দলের যে সব কর্মী তোলাবাজির সঙ্গে যুক্ত, দুধের ওপর মাছি পড়লে যেমন ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া হয় , তাদেরও তেমনি দল থেকে ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া হবে। দলের এক বিধায়ক জিতেন তেওয়ারি বলেছেন,গত ১৫ বছরে তৃণমূল কংগ্রেসের আমলে যা তোলাবাজি হয়েছে , আমাদের পাঁচ মাসের শাসনে তোলাবাজি সেই সীমা ছাড়িয়ে গিয়েছে । এঁদের সকলের বক্তব্যেই এটা পরিষ্কার যে এই তোলাবাজির সঙ্গে দলের একাংশ যুক্ত হয়ে পড়েছে। কিন্তু দলের রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য এই ধরনের ঘটনা সম্পর্কে তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করলেই বলছেন , যারা এসব করছে তারা দলের কেউ নয়। তাহলে তারা কারা? কেন পুলিশ তাদের বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা নেয় না? যখন বিরোধী দলের নেতা ও কর্মীদের ওপর ডিম ছুড়ে মারা হচ্ছে , তখনও শমীক বাবু বলে চলেছেন এটা বিজেপি'র সংস্কৃতি নয়। মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী তোলাবাজি ও যখন বিরোধীদের (পড়ুন তৃণমূল) বিরুদ্ধে ডিম্বক বর্ষণ করা হচ্ছে তার বিরুদ্ধে একটি কথাও কখনও বলেন নি। গদি মিডিয়া বলে চলেছে এটা জনরোষের প্রতিফলন। তাহলে তোলাবাজি কিসের প্রতিফলন ? এর কোনও উত্তর স্বাভাবিক ভাবেই গদি মিডিয়ার দেওয়ার কথা নয় এবং তোলাবাজি নিয়ে তারা নিশ্চুপ। প্রশাসনের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তি যদি ডিম্বক বর্ষণ সম্পর্কে নিশ্চুপ থাকেন তাহলে এই দুষ্কৃতকারীরা স্বভাবতই উৎসাহিত হবে এবং তাই হয়েছে। শমীক বাবু সম্প্রতি খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আক্রমণ শানিয়েছেন । তাঁর অভিযোগ এই সপ্রদায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সাধারণ মানুষকে ধর্মান্তরিত করছে । কোনও নির্দিষ্ট উদাহরণ তিনি দেন নি। ইতিমধ্যে বিভিন্ন জেলায় খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে অন্তত ৬০ টি আক্রমণের ঘটনা ঘটেছে বলে খ্রিস্টানদের সংগঠন অভিযোগ করেছেন।

কিছুদিন আগে তৃণমূল কংগ্রেসের বর্ষীয়ান নেতা অসুস্থ উজ্জ্বল বিশ্বাসের বাড়িতে ঢুকে তাঁকে বারবার ডিম ছুঁড়ে মারা হয়। শ্রী বিশ্বাসকে এই ভাবে ডিম ছুড়ে মারার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করায় একজন শিক্ষিকা আক্রান্ত হন ও তার গায়ে সাদা থান কাপড় জড়িয়ে দেওয়া হয়। উজ্জ্বলবাবুর বিরুদ্ধে অভিযোগ তিনি রিলিফের ত্রিপল ইত্যাদি তাঁর বাড়িতে রেখেছিলেন ।প্রকৃত ঘটনা হল জরুরি পরিস্থিতিতে ত্রাণ বিতরণের জন্য কিছু সামগ্রী সব বিধায়কের কাছেই রাখা থাকে । নির্বাচনে পরাস্ত হবার পর তিনি স্থানীয় বিডিওকে চিঠি দিয়ে এগুলি নিয়ে যাওয়ার জন্য বলেন। বারবার বলার পর বিডিও একটি লরি পাঠান। সঙ্গে পুলিশ ছিলো এবং কিছু দুষ্কৃতকারী। এরাই উজ্জ্বল বাবুকে যারপরনাই হেনস্থা করেন। পুলিশ নিষ্ক্রিয় ছিল। উল্টে তারা উজ্জ্বল বাবুকে গ্রেপ্তার করে। তিনি বেশ কয়েকদিন পর জামিন পান। গুরুতর অসুস্থ উজ্জ্বলবাবুকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সেখানে তিনি মারা যান। ওই অপমানের আঘাত তিনি সহ্য করতে পারেননি। মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী তো উজ্জ্বলবাবুর সঙ্গে দীর্ঘদিন এক দল করেছেন। তিনি তো এই ঘটনার অন্তত নিন্দা করতে পারতেন। দল বদলালে কি সব কিছু ভুলে যেতে হয়?

বোধ হয় ভুলে যেতে হয় । মেদিনীপুর শহরে কয়েক দিন আগে একজন বিজেপি কর্মী একটি হোর্ডিং দিয়ে মহাত্মা গান্ধীর হত্যাকারী নাথুরাম গডসেকে শ্রদ্ধা জানিয়েছে। বিজেপির স্থানীয় নেতৃত্ব বলেছেন এটি ওই ব্যক্তির নিজস্ব ব্যাপার । প্রশাসন নির্বিকার, নিশ্চুপ। মুখ্যমন্ত্রী এই সময়ে ঝাড়গ্রাম গিয়েছিলেন । তিনিও এ বিষয়ে নিশ্চুপ ।শহীদ ক্ষুদিরাম, মাতঙ্গিনী হাজরা , আগস্ট বিপ্লবের নায়ক সতীশ সামন্ত , অজয় মুখার্জী , সুশীল ধারার দেশে এখন ব্রিটিশ এজেন্ট ও মহাত্মা গান্ধীর হত্যাকারী নাথুরাম গডসে পূজিত হচ্ছে । সবাই কি সব ভুলে গিয়েছেন ?

এর পর আর বলে দিতে হবে না রাজ্য কোন পথে চলেছে ।

প্রসঙ্গ : জাতীয়তাবাদ ও ধর্ম

‘পাশ্চাত্য ও জাপানের উগ্র জাতীয়তাবাদ’ সম্পর্কে ভারতীয় প্রেক্ষিতে কবিগুরুর সমালোচনা

শুভাশিস মজুমদার

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ছিলেন আন্তর্জাতিকতাবাদী চিন্তাবিদ।নিজের জাতি, দেশ, সংস্কৃতি ও জাতীয় পরিচয়ের প্রতি গভীর ভালোবাসা, আনুগত্য এবং ঐক্যবোধ সম্পৃক্ত দেশাত্মবোধে তিনি বিশ্বাস করতেন । কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের চিন্তাধারায় দেশপ্রেম ও বিশ্বমানবতার মধ্যে একটি বিশেষ সম্পর্ক ছিল। বিশ্বমানবতার আদর্শে বিশ্বাসী রবীন্দ্রনাথ জাতি, ধর্ম ও দেশের সীমানার ঊর্ধ্বে উঠে সমগ্র মানবজাতির ঐক্যের কথা বলেছেন। তিনি সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদের বিরোধী ছিলেন। অন্ধ জাতীয়তাবাদ ও আগ্রাসী জাতীয়তাবাদের আপোষহীন সমালোচনা করেছেন। তাঁর মতে, জাতীয় স্বার্থ যেন মানবতার স্বার্থকে অতিক্রম না করে।

বিশ্বসংস্কৃতির মিলনের বিশিষ্ট পথিকৃৎ হিসাবে তিনি ভারতীয় সংস্কৃতির সঙ্গে বিশ্বের অন্যান্য সংস্কৃতির আদান-প্রদান ও সমন্বয়ে বিশ্বাস করতেন। ১৯২১ সালে প্রতিষ্ঠিত বিশ্বভারতীর মাধ্যমে তিনি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের জ্ঞান ও সংস্কৃতির মিলন ঘটাতে চেয়েছিলেন। আন্তর্জাতিকতাবাদী রবীন্দ্রনাথ বিশ্বের বিভিন্ন দেশের মানুষের মধ্যে পারস্পরিক শ্রদ্ধা, সহযোগিতা ও সাংস্কৃতিক বিনিময়ের পক্ষে ছিলেন।

বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে দেশে বিদেশে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যে সমস্ত ভাষণ দান করেন, সেগুলি তাঁর ‘ন্যাশনালিজম’ গ্রন্থটিতে লিপিবদ্ধ আছে, যা কেবল জাতীয়তাবাদ সম্পর্কে একটি দার্শনিক আলোচনা নয়; এটি আধুনিক সভ্যতার সংকট, রাষ্ট্রের ক্ষমতালিপ্সা, মানুষের স্বাধীনতা এবং সমাজের নৈতিক ভিত্তি নিয়ে এক গভীর আত্মজিজ্ঞাসা। ১৯১৬ সালে প্রকাশিত এই গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ জাপান, পাশ্চাত্য দুনিয়া ও ভারতবর্ষের রাজনৈতিক-সামাজিক বাস্তবতাকে বিশ্লেষণ করে জাতীয়তাবাদের এমন একটি পর্যবেক্ষণ (পড়ুন সমালোচনা) উপস্থাপিত করেন, যা এক শতাব্দীরও বেশি সময় পরেও প্রাসঙ্গিক। তাঁর মূল বক্তব্য, দেশকে ভালোবাসা এবং জাতীয়তাবাদের নামে রাষ্ট্রের আধিপত্যকে নিরঙ্কুশ করে তোলা এক বিষয় নয়। দেশপ্রেম মানুষের মধ্যে সংহতি, আত্মত্যাগ ও সৃজনশীলতার জন্ম দিতে পারে; কিন্তু জাতীয়তাবাদ যখন যান্ত্রিক রাষ্ট্রশক্তি, অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতা, সামরিক আগ্রাসন ও সংকীর্ণ পরিচয়ের হাতিয়ার হয়ে ওঠে, তখন তা মানুষের মুক্তির পরিবর্তে মানুষের উপরেই কঠিন শাসন প্রতিষ্ঠা করে।

আজকের ভারতবর্ষে ধর্মীয় মেরুকরণ, সংখ্যাগরিষ্ঠতাবাদ, রাজনৈতিক বিরোধিতার (সংকুচিত) পরিসর, জাতীয় নিরাপত্তার প্রশ্ন, অর্থনৈতিক বৈষম্য এবং নাগরিকত্বের ধারণাকে ঘিরে যে বিতর্কগুলি দেখা যাচ্ছে, রবীন্দ্রনাথের ‘ন্যাশনালিজম’ (জাতীয়তাবাদ) সেই পরিস্থিতিকে বিচার করার একটি গুরুত্বপূর্ণ নৈতিক ও বৌদ্ধিক দৃষ্টিভঙ্গি প্রদান করে। রবীন্দ্রনাথের জাপান-পর্যালোচনার কেন্দ্রে রয়েছে একটি দ্বন্দ্ব। আধুনিকতার অনুকরণ, না আত্মপরিচয়ের বিকাশ !

রবীন্দ্রনাথ পাঁচবার জাপান ভ্রমণ করেন, তার মধ্যে তিনবার তিনি বিভিন্ন বিষয়ে জাপানে ভাষণ দান করেন।

প্রথম ভ্রমণেই, ১৯১৬ সালে, জাপানে তাঁর জাতীয়তাবাদ-বিরোধী বক্তব্যের জন্য সবচেয়ে বেশি আলোচিত হয়েছিল ‘ন্যাশনালিজম ইন জাপান’ (জাপানে জাতীয়তাবাদ) ভাষণটি। একদিকে জাপানের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য, সৌন্দর্যবোধ, শৃঙ্খলা ও সামাজিক সংহতির প্রতি তিনি গভীর শ্রদ্ধা প্রকাশ করেন; অন্যদিকে পাশ্চাত্যের অনুকরণে সামরিক শক্তি, রাষ্ট্রকেন্দ্রিক আগ্রাসী জাতীয়তাবাদ ও সাম্রাজ্যবাদী প্রবণতার সম্পর্কে তীব্র সমালোচনা করেন। তাঁর এই বক্তব্য জাপানের কিছু বুদ্ধিজীবী ও সংবাদমাধ্যমের মধ্যে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছিল।

উনিশ শতকের শেষভাগে মেইজি পুনর্গঠনের (১৮৬৮ সালে জাপানে সম্রাট মেইজির শাসন পুনঃপ্রতিষ্ঠা) পর জাপান দ্রুত আধুনিক শিল্প, প্রযুক্তি, প্রশাসন ও সামরিক শক্তিতে উন্নতি করে। ১৯০৫ সালে রুশ-জাপান যুদ্ধে জাপানের বিজয় এশিয়ার মানুষের কাছে পশ্চিমি সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে আত্মপ্রতিষ্ঠার একটি সম্ভাবনার প্রতীক হয়ে উঠেছিল। রবীন্দ্রনাথও জাপানের জাগরণে প্রথমদিকে এশীয় আত্মমর্যাদার সম্ভাবনা দেখেছিলেন। কিন্তু তাঁর আশঙ্কা ছিল, আধুনিকতার নামে জাপান যদি পাশ্চাত্যের সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রব্যবস্থাকেই অনুকরণ করে, তবে তার আত্মিক ও সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য বিপন্ন হবে।

রবীন্দ্রনাথের কাছে বিপদের জায়গাটি ছিল এই যে, একটি জাতি যখন নিজের শক্তিকে অন্য জাতির উপর আধিপত্য বিস্তারের মাধ্যমে প্রমাণ করতে চায়, তখন তার আত্মপ্রতিষ্ঠা ক্রমশ আত্মবিস্মৃতিতে পরিণত হয়। শিল্প ও প্রযুক্তির উন্নতি তখন মানুষের জীবনকে সমৃদ্ধ করার পরিবর্তে রাষ্ট্রের ক্ষমতা বৃদ্ধির উপায় হয়ে দাঁড়ায়। জাতীয় গৌরবের নামে সামরিকতন্ত্র ও সম্প্রসারণবাদ সমাজের নৈতিক বোধকে গ্রাস করতে পারে।

সমকালীন ভারতবর্ষের ক্ষেত্রেও এই প্রশ্নটি গুরুত্বপূর্ণ। দেশের প্রতিরক্ষা, প্রযুক্তি, অর্থনীতি ও আন্তর্জাতিক মর্যাদা বৃদ্ধি অবশ্যই জরুরি। কিন্তু উন্নয়ন বা জাতীয় গৌরবের মূল্যায়ন কি কেবল সামরিক শক্তি, অর্থনৈতিক পরিসংখ্যান কিংবা আন্তর্জাতিক প্রতিপত্তি দিয়ে হবে? নাকি তার সঙ্গে নাগরিকের স্বাধীনতা, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সামাজিক ন্যায় এবং দুর্বল মানুষের মর্যাদাকেও যুক্ত করতে হবে?

রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে প্রকৃত জাতীয় উন্নতি সেই উন্নতি, যা মানুষের জীবনকে প্রসারিত করে; যে উন্নতি রাষ্ট্রকে শক্তিশালী করার পাশাপাশি মানুষকেও স্বাধীন, সৃজনশীল ও মর্যাদাবান করে তোলে।

'ন্যাশনালিজম ইন দ্য ওয়েস্ট' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ পাশ্চাত্য জাতীয়তাবাদের একটি মৌলিক বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত করেন;রাষ্ট্রের সংগঠিত ক্ষমতা এবং অর্থনৈতিক স্বার্থের সঙ্গে জাতীয় জীবনের ক্রমবর্ধমান অভিন্নতা। তাঁর মতে, আধুনিক পাশ্চাত্য রাষ্ট্র অনেক ক্ষেত্রে এমন এক যন্ত্রে পরিণত হয়েছে, যার প্রধান উদ্দেশ্য উৎপাদন বৃদ্ধি, বাজার দখল, রাজনৈতিক আধিপত্য বিস্তার এবং প্রতিযোগিতায় অন্যকে পরাজিত করা। রাষ্ট্রের এই যান্ত্রিক সংগঠন মানুষের নৈতিকতা, সহমর্মিতা ও সৃজনশীলতার উপর প্রাধান্য বিস্তার করলে সভ্যতার অন্তর্নিহিত মানবিক উদ্দেশ্য বিপন্ন হয়।

রবীন্দ্রনাথ পাশ্চাত্যের বিজ্ঞান, শিক্ষা, যুক্তিবাদ ও মুক্তচিন্তাকে প্রত্যাখ্যান করেননি। তাঁর আপত্তি পাশ্চাত্য সভ্যতার সমস্ত অর্জনের বা সাফল্যের বিরুদ্ধে নয়; বরং সেই সভ্যতার ক্ষমতাকেন্দ্রিক ও সাম্রাজ্যবাদী রূপের বিরুদ্ধে। তিনি মনে করেন, পাশ্চাত্যের মানবতাবাদী আদর্শ এবং পাশ্চাত্যের রাষ্ট্রগুলির ঔপনিবেশিক আচরণের মধ্যে গভীর বিরোধ রয়েছে। স্বাধীনতা ও মানবাধিকারের কথা বলেও শক্তিশালী রাষ্ট্র দুর্বল জাতিকে শোষণ করতে পারে। জাতীয় স্বার্থের নামে অন্যায়কে বৈধতা দেওয়ার এই প্রবণতাই তাঁর সমালোচনার কেন্দ্রে।

২০২৬ সালের ৩ জানুয়ারি ভেনেজুয়েলার তৎকালীন রাষ্ট্রপতি নিকোলাস মাদুরো এবং তাঁর স্ত্রী সিলিয়া ফ্লোরেসকে মার্কিন বাহিনী সামরিক অভিযানে আটক করে যুক্তরাষ্ট্রে নিয়ে যায়। দেলসি রদ্রিগেজ (মাদুরোর ভাইস প্রেসিডেন্ট ছিলেন) ৫ জানুয়ারি ২০২৬-এ অন্তর্বর্তী রাষ্ট্রপতি হিসাবে শপথ নেন। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প সাময়িকভাবে দেশটি পরিচালনার কথা বলেছিলেন এবং পরবর্তী সরকার ও তেলশিল্পের ওপর মার্কিন প্রভাব বিস্তারের উদ্যোগ নেন। ডোনাল্ড ট্রাম্পের সরাসরি সমর্থনে ইসরাইলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু-র গাজা ভূখণ্ডে ও ইরানের উপর আগ্রাসী আক্রমণ ও গণহত্যা চালানো, আরও একটি উদাহরণ। তাতে ইজরাইলেও অনেক প্রাণনাশ ও ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে।

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প, ২০২৫ সাল থেকে, খেয়ালখুশি মত, বিভিন্ন দেশের পণ্যের ওপর অস্বাভাবিক উচ্চহারে আমদানি-শুল্ক আরোপ করছেন এবং কিছু ক্ষেত্রে বাণিজ্যিক বিধিনিষেধও জারি করছেন। ট্রাম্পের এই শুল্কনীতির জন্য ভারতের রপ্তানি-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে এবং অন্যান্য দেশের সঙ্গে ভারতের কূটনৈতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে নেতিবাচক প্রভাব পড়তে পারে।

আজকের ভারতীয় রাজনীতিতে রবীন্দ্রনাথের এই বিশ্লেষণ একটি তাৎপর্যপূর্ণ প্রশ্ন উত্থাপন করে: রাষ্ট্রের শক্তি বৃদ্ধি কি নিজে থেকেই গণতন্ত্রের শক্তি বৃদ্ধি করে? একটি দেশ অর্থনৈতিকভাবে উন্নত, প্রযুক্তিগতভাবে অগ্রসর কিংবা আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে প্রভাবশালী হতে পারে; কিন্তু সেই দেশের নাগরিক যদি প্রশ্ন করার অধিকার, মতপ্রকাশের স্বাধীনতা ও ন্যায়বিচারের সমান সুযোগ থেকে বঞ্চিত হন, তবে উন্নয়নের সাফল্য অসম্পূর্ণ থেকে যায়।

বর্তমান বিশ্বে জাতীয় নিরাপত্তা, সীমান্তরক্ষা এবং আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতা বাস্তবে প্রয়োজন। কিন্তু এই প্রয়োজনের অজুহাতে সব ধরনের সরকারি সিদ্ধান্তকে প্রশ্নাতীত করে তোলা কিংবা বিরোধিতাকে দেশবিরোধিতার সঙ্গে এক করে দেখা গণতান্ত্রিক চেতনার পরিপন্থী। রবীন্দ্রনাথের বক্তব্যের তাৎপর্য এখানেই;রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্যের চেয়েও মানুষের প্রতি দায়বদ্ধতা বড়। জাতীয় স্বার্থের নামে কোনো অন্যায় সংঘটিত হলে তার সমালোচনা করা দেশপ্রেমের বিরোধিতা নয়; বরং দেশকে ন্যায়ভিত্তিক করে তোলারই একটি উপায়।

রবীন্দ্রনাথের ন্যাশনলিজম ইন ইন্ডিয়া প্রবন্ধটির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং বিতর্কিত বক্তব্য হল, ভারতবর্ষের ঐতিহাসিক

পরিচয়কে ইউরোপীয় জাতিরাষ্ট্রের ছাঁচে সম্পূর্ণভাবে ব্যাখ্যা করা যায় না। ভারতের সভ্যতা গড়ে উঠেছে বহু ভাষা, ধর্ম, জাতি, সম্প্রদায় ও সাংস্কৃতিক ধারার পারস্পরিক সংযোগে। এই বৈচিত্র্যকে মুছে দিয়ে একটি একক রাজনৈতিক বা সাংস্কৃতিক পরিচয়ের মধ্যে সবাইকে আবদ্ধ করার পরিবর্তে, বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে মিলনের ভিত্তি নির্মাণ করাই ভারতের ঐতিহাসিক চ্যালেঞ্জ।

রবীন্দ্রনাথের মতে, ভারতের শক্তি কেবল রাজনৈতিক সংগঠনে নয়, তার সামাজিক সমন্বয় এবং বহুত্বের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠার ক্ষমতায়। এই ঐক্য কোনো একটি সম্প্রদায়ের আধিপত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। এর জন্য প্রয়োজন পারস্পরিক শ্রদ্ধা, সামাজিক দায়িত্ব এবং অন্যের স্বাতন্ত্র্যকে স্বীকার করার মানসিকতা। ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ জাতীয়তাবাদের পরিবর্তে সমাজের ঐক্যের উপর বেশি গুরুত্ব দিয়েছিলেন।

ঔপনিবেশিক শাসনের অধীনে ভারতবর্ষের স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা যে ন্যায়সংগত, রবীন্দ্রনাথ তা অস্বীকার করেননি। কিন্তু তাঁর আশঙ্কা ছিল, স্বাধীনতা অর্জনের আন্দোলন যদি সংকীর্ণ জাতীয় অহংকারে পরিচালিত হয়, তবে রাজনৈতিক স্বাধীনতা পেলেও মানুষ প্রকৃত অর্থে মুক্ত হবে না। বিদেশি শাসকের পরিবর্তে দেশীয় ক্ষমতাশালী গোষ্ঠী যদি সাধারণ মানুষের উপর আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করে, তবে স্বাধীনতার মূল উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হবে। এখানে রবীন্দ্রনাথের চিন্তার একটি বিশেষ দিক লক্ষণীয়। তিনি একদিকে ভারতীয় আত্মমর্যাদা ও আত্মনির্ভরতার কথা বলেছেন, অন্যদিকে পাশ্চাত্য সভ্যতার সঙ্গে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার পক্ষেও সওয়াল করেননি। তাঁর কাছে আদর্শ ছিল পারস্পরিক আদানপ্রদান; ভারত পাশ্চাত্যের কাছ থেকে বিজ্ঞান, জ্ঞান ও আধুনিকতার শিক্ষা গ্রহণ করবে, আবার নিজের সভ্যতার মানবিক সম্পদও বিশ্বের সামনে তুলে ধরবে। আত্মপরিচয় মানে আত্মবিচ্ছিন্নতা নয়; বরং নিজের ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে বিশ্বমানবতার সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন।

এই দর্শন আজকের ভারতবর্ষের জন্য বিশেষভাবে প্রাসঙ্গিক। ভারতের সংবিধান ধর্মনিরপেক্ষতা, গণতন্ত্র, সাম্য, স্বাধীনতা ও ভ্রাতৃত্বের যে আদর্শ তুলে ধরে, রবীন্দ্রনাথের বহুত্ববাদী সমাজভাবনার সঙ্গে তার গুরুত্বপূর্ণ মিল রয়েছে। জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠার অর্থ যদি হয় ভাষা, ধর্ম, খাদ্যাভ্যাস কিংবা সাংস্কৃতিক পরিচয়ের পার্থক্যকে অস্বীকার করা, তবে সেই ঐক্য স্থায়ী হতে পারে না। প্রকৃত ঐক্য গড়ে ওঠে তখনই, যখন মানুষ তার স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখেও বৃহত্তর সমাজের সমান মর্যাদাসম্পন্ন সদস্য হিসেবে স্বীকৃতি পায়।

রবীন্দ্রনাথের মতাদর্শে ভারতের সমকালীন রাজনীতিকেও পর্যালোচনা করা যেতে পারে।

২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনের পর ভারতের অষ্টাদশ লোকসভায় কোনও একক দল একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করেনি; বিজেপির নেতৃত্বাধীন এনডিএ জোট সরকার গঠন করে। এই রাজনৈতিক পরিস্থিতি সংসদীয় গণতন্ত্রে জোট, বিরোধী দলের ভূমিকা এবং ক্ষমতার ভারসাম্যের গুরুত্বকে নতুন করে সামনে এনেছে।

এই প্রেক্ষাপটে রবীন্দ্রনাথের জাতীয়তাবাদ-সমালোচনা কয়েকটি মৌলিক প্রশ্ন উত্থাপন করে।

প্রথমত, সংখ্যাগরিষ্ঠতার রাজনীতি ও বহুত্ববাদের সম্পর্কঃ গণতন্ত্রে সংখ্যাগরিষ্ঠের মতামত গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু সংখ্যাগরিষ্ঠের সিদ্ধান্তই ন্যায়ের চূড়ান্ত মানদণ্ড নয়। ধর্মীয় বা সাংস্কৃতিক সংখ্যাগরিষ্ঠতার পরিচয়কে যদি জাতীয় পরিচয়ের একমাত্র মাপকাঠি হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা হয়, তবে সংখ্যালঘুদের সমান নাগরিকত্বের ধারণা দুর্বল হতে পারে। রবীন্দ্রনাথের ভারতভাবনা আমাদের মনে করিয়ে দেয়, দেশ কোনও একক সম্প্রদায়ের সম্পত্তি নয়; দেশের প্রতিটি নাগরিক তার সমান অধিকারী।

দ্বিতীয়ত, দেশপ্রেম ও রাজনৈতিক বিরোধিতার সম্পর্কঃ সমকালীন রাজনীতিতে কোনও সরকারি নীতি, রাজনৈতিক নেতৃত্ব বা রাষ্ট্রের সিদ্ধান্তের সমালোচনাকে কখনও কখনও জাতীয় স্বার্থের বিরোধিতা হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। কিন্তু গণতন্ত্রের প্রাণ হল মতবিরোধের স্বাধীনতা। সরকারের সমালোচনা করা এবং দেশের বিরোধিতা করা এক বিষয় নয়। বরং ভুল নীতির প্রতিবাদ, দুর্নীতির অনুসন্ধান এবং নাগরিক অধিকার রক্ষার দাবি রাষ্ট্রকে আরও দায়বদ্ধ করে। রবীন্দ্রনাথের মানবতাবাদী দৃষ্টিতে অন্ধ আনুগত্যের চেয়ে বিবেকের স্বাধীনতা অধিক মূল্যবান।

তৃতীয়ত, উন্নয়ন ও সামাজিক ন্যায়ের প্রশ্ন: অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, পরিকাঠামো নির্মাণ, প্রযুক্তির প্রসার এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ভারতের মর্যাদা বৃদ্ধি গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য। কিন্তু সেই অগ্রগতির সুফল কারা পাচ্ছেন, কৃষক ও শ্রমজীবী মানুষের জীবন কতটা উন্নত হচ্ছে, শিক্ষার ও চিকিৎসার সুযোগ কতটা সমানভাবে বিস্তৃত হচ্ছে;এই প্রশ্নগুলিও সমান গুরুত্বপূর্ণ। রবীন্দ্রনাথের বিশ্লেষণ অনুসারে, রাষ্ট্রের সাফল্যকে কেবল তার দৃশ্যমান শক্তি দিয়ে বিচার করা যায় না; বিচার করতে হয় মানুষের জীবনে তার প্রভাব দিয়ে।

চতুর্থত, ধর্মীয় মেরুকরণ ও সামাজিক সংহতি: নির্বাচনী রাজনীতিতে ধর্মীয় পরিচয় যখন রাজনৈতিক সমর্থন সংগ্রহের প্রধান হাতিয়ার হয়ে ওঠে, তখন বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে অবিশ্বাস ও দূরত্ব বাড়ার আশঙ্কা থাকে। রবীন্দ্রনাথের কাছে ভারতীয় সমাজের ঐক্য ছিল দীর্ঘ ঐতিহাসিক সহাবস্থান ও পারস্পরিক আদানপ্রদানের ফল। সেই ঐক্যকে রক্ষা করার জন্য শুধু আইনি ব্যবস্থা যথেষ্ট নয়; প্রয়োজন শিক্ষা, সাংস্কৃতিক সংলাপ এবং মানুষের মধ্যে মানবিক সম্পর্কের বিকাশ।

তবে রবীন্দ্রনাথের বিশ্লেষণ হল সর্বকালীন। তাঁর চিন্তার শক্তি হল, তা যে কোনও শাসক, দল বা মতাদর্শের ক্ষমতালিপ্সাকে প্রশ্ন করতে পারে। যে পক্ষই জাতীয় গৌরবের নামে মানবিক মর্যাদা খর্ব করবে, যে পক্ষই বিরোধী মতকে অস্বীকার করবে, কিংবা যে পক্ষই সামাজিক বিভাজনকে রাজনৈতিক স্বার্থে ব্যবহার করবে, তার ক্ষেত্রেই রবীন্দ্রনাথের সতর্কবাণী প্রযোজ্য।

রবীন্দ্রনাথের ন্যাশনালিজম আমাদের শেখায়, দেশপ্রেমের মূল্য নির্ধারিত হয় না কেবল জাতীয় পতাকা, সামরিক শক্তি, অর্থনৈতিক সাফল্য কিংবা অতীতের গৌরবের মাধ্যমে। একটি দেশ কতটা মানবিক, কতটা ন্যায়ভিত্তিক এবং কতটা স্বাধীন চিন্তার পরিসর তৈরি করতে পারে, তার মধ্যেই তার প্রকৃত মহত্ত্বের পরিচয় নিহিত। অর্থাৎ তাঁর মতে, রাষ্ট্রের ঊর্ধ্বে মানুষ, জাতীয় গৌরবের ঊর্ধ্বে মানবমর্যাদা।

জাপানের ক্ষেত্রে তিনি দেখিয়েছেন, আধুনিকতার অনুকরণ করতে গিয়ে একটি দেশ তার আত্মিক স্বাতন্ত্র্য হারাতে পারে। পাশ্চাত্যের ক্ষেত্রে দেখিয়েছেন, সংগঠিত রাষ্ট্রশক্তি ও অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতা মানবতার আদর্শকে গ্রাস করতে পারে। আর ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে তাঁর প্রত্যাশা ছিল এমন এক সমাজ, যেখানে বহুত্বের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হবে এবং দেশপ্রেম বিশ্বমানবতার বিরোধী হয়ে উঠবে না।

বর্তমান ভারতবর্ষের রাজনৈতিক বাস্তবতায় তাঁর এই দর্শনের তাৎপর্য গভীর। জাতীয়তাবাদ যদি নাগরিককে নিজের দেশ ও সমাজের প্রতি দায়বদ্ধ করে, তবে তা ইতিবাচক শক্তি। কিন্তু যদি তা' প্রশ্নহীন আনুগত্য, ধর্মীয় বিদ্বেষ, সংখ্যাগরিষ্ঠের আধিপত্য কিংবা রাজনৈতিক (পড়ুন দলীয়) স্বার্থে কাল্পনিক শত্রু নির্মাণের হাতিয়ার হয়ে ওঠে, তবে তা' দেশের পক্ষে ভয়ঙ্কর ক্ষতিকারক।

বিভেদ সৃষ্টি ও ঐক্য স্থাপনের চেষ্টায় ধর্মের ভূমিকা

মজিবুর রহমান

মুক্তমনা ও শুভবুদ্ধিসম্পন্ন নাগরিকেরা মনে করেন, ধর্ম ব্যক্তিগত ব্যাপার। ধর্ম পালন করার জন্য মন্দির মসজিদের মতো কিছু উপসনালয় দরকার হলেও কোনো বৃহৎ ধর্মীয় সংগঠনের প্রয়োজন নেই এবং রাষ্ট্রীয় পরিসরে ধর্মের উপস্থিতি কাম্য নয়। কিন্তু একশ্রেণির মানুষ তাদের কায়েমী স্বার্থে ধর্মের অনুষঙ্গভিত্তিক সংগঠন তৈরি করে। এই সংগঠনগুলো সামাজিক, রাজনৈতিক তে চায়। স্বধর্মীদের ঐক্যবদ্ধ করার পাশাপাশি এরা ভিন ধর্মাবলম্বী তথা বিধর্মীদের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ ছড়ায় এবং ধর্মের নামে বিভেদ সৃষ্টি করে। বাংলায় হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে বিদ্যমান বিভেদের বয়স প্রায় দেড়শো বছর। তবে বিভেদ সৃষ্টির সময় থেকেই হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে মৈত্রী গড়ে তোলার আহ্বানও শোনা গেছে। বিভেদ সৃষ্টির চেষ্টা করেছেন রাজনৈতিক ও ধর্মীয় নেতারা। ঐক্য স্থাপনে প্রয়াসী হয়েছেন সাহিত্যিক ও সমাজ সংস্কারকরা। বিভেদ সৃষ্টিকারীরা ধর্মের ব্যাপারে প্রচলিত ধারণার বিপরীত বক্তব্য শুনতে ও সহ্য করতে প্রস্তুত থাকেন না। কিন্তু ঐক্য স্থাপনে প্রয়াসীরা পরমতসহিষ্ণু হওয়ার পরামর্শ দেন।

বর্তমান নিবন্ধে প্রথমে ধর্ম নিয়ে দেশবিদেশের কয়েকটি ভয়ঙ্কর ঘটনার উল্লেখ করা হয়েছে। পরে ধর্মের ব্যাপারে বিশিষ্ট বাঙালিদের দৃষ্টিভঙ্গির ওপর আলোকপাত করা হয়েছে। গ্রিক দার্শনিক সক্রেটিস (আনুমানিক ৪৭০-৩৯৯ খ্রিস্ট পূর্বাব্দ) এথেন্সের মানুষের মধ্যে যুক্তিবাদ প্রচার করতেন। সব বিষয়ে প্রশ্ন করতে শেখাতেন। প্রচলিত বিশ্বাসকে আঁকড়ে ধরে না থেকে, তা যুক্তি দিয়ে বিচার করে দেখতে বলতেন। তাঁর এই আচরণের জন্য তাঁর বিরুদ্ধে ধর্মদ্রোহিতা এবং যুবসমাজকে বিপথগামী করার অভিযোগ আনা হয়। গণ-আদালতের বিচারে বিষ (হেমলক) পান করিয়ে তাঁর মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়।

ইতালীয় জ্যোতির্বিজ্ঞানী জিওর্নাদো ব্রুনো (১৫৪৮-১৬০০) তৎকালীন রক্ষণশীল সমাজ ও গির্জার ধারণার বিরুদ্ধে গিয়ে মহাবিশ্ব সম্পর্কে নতুন মতবাদ প্রচার করেন। এজন্য রোমান ক্যাথলিক চার্চ তাঁকে 'ধর্মের শত্রু' হিসেবে গণ্য করে। ১৫৯২ সালে তাঁকে বন্দি করা হয় এবং ১৬০০ সালের ১৭ ফেব্রুয়ারি রোমের 'কাম্পো দে ফিওরি'

চত্বরে জীবন্ত পুড়িয়ে হত্যা করা হয়। গ্যালিলিও গ্যালিলেই (১৫৬৪-১৬৪২) টেলিস্কোপ আবিষ্কার করেন এবং সূর্যকেন্দ্রিক সৌরজগতের মতবাদ প্রচার করেন। এই বৈজ্ঞানিক মতবাদকে তৎকালীন ক্যাথলিক চার্চ ধর্মবিরোধী বলে মনে করে। ১৬৩৩ সালে ধর্মীয় আদালত (ইনকুইজিশন) গ্যালিলিওকে দোষী সাব্যস্ত করে এবং জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তাঁকে গৃহবন্দী করে রাখা হয়।

মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী (১৮৬৯-১৯৪৮) ছিলেন একজন মহান স্বাধীনতা সংগ্রামী এবং ব্যক্তিগত জীবনে নিষ্ঠাবান হিন্দু। তিনি রাজনীতি তথা রাষ্ট্রীয় জীবনে হিন্দু মুসলমানের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির ঘোর বিরোধী ছিলেন। সংখ্যালঘু সম্প্রদায় হিসেবে মুসলিমদের প্রতি তাঁর একটা সহানুভূতি ছিল। তাঁর এই অবস্থান হিন্দুত্ববাদী শক্তিকে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ করে তোলে এবং মারাঠি হিন্দুত্ববাদী সংগঠক নাথুরাম গডসে গান্ধীজিকে বুলেটবিদ্ধ করে হত্যা করেন।

গোবিন্দ পানসারে (১৯৩৩-২০১৫) ছিলেন একজন বামপন্থী রাজনীতিবিদ এবং মারাঠি লেখক। তিনি ২১টি বই লিখেছেন, যার বেশিরভাগেরই উপজীব্য হল সামাজিক অনাচার। তিনি একটি সংস্থার মাধ্যমে আন্তঃবর্ণ বিবাহকে উৎসাহিত এবং সেই সঙ্গে পুত্র সন্তানের কামনায় আয়োজিত পুত্রকামেষ্ঠী যজ্ঞের বিরোধিতা করতেন। এরূপ কাজের জন্য তিনি ধর্মীয় মৌলবাদী শক্তির হাতে খুন হন। এম এম কালবুর্গী (১৯৩৮-২০১৫) ছিলেন হাম্পির কন্নড় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ও বিশিষ্ট লেখক। তিনি জাতীয় সাহিত্য আকাদেমি পুরস্কার পেয়েছিলেন। তাঁর রচনায় 'ধর্মীয় ভাবাবেগ'-এ আঘাত করার জন্য একাধিকবার বিতর্কের সৃষ্টি হয়। শেষ পর্যন্ত ধর্মীয় মৌলবাদীরা তাঁর বাড়িতে গিয়ে গুলি করে তাঁকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দেয়। নরেন্দ্র দাভোলকার (১৯৪৫-২০১৩) সমাজ থেকে কুসংস্কার দূর করে মানুষকে বিজ্ঞানমনস্ক করার ব্রত গ্রহণ করেছিলেন। তিনি ছিলেন 'মহারাষ্ট্র অন্ধ শ্রদ্ধা নির্মূলন সমিতি'-র প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি। তিনি তাঁর কাজের জন্য ধর্মীয় সংগঠন ও তথাকথিত সমাজপতিদের বিরাগভাজন হন। পুনেতে প্রাতঃভ্রমণের সময় আততায়ীদের গুলিতে তিনি প্রাণ হারান। ২০১৪ সালে তাঁকে মরণোত্তর পদ্মশ্রী সম্মান প্রদান করা হয়।

ভারতীয় বংশোদ্ভূত ব্রিটিশ সাহিত্যিক সলমন রুশদি (১৯.৬.১৯৪৭) রচিত 'দ্য স্যাটানিক ভার্সেস' উপন্যাসে ইসলাম ধর্মের অবমাননা করা হয়েছে, এই অভিযোগে ১৯৮৯ সালে ইরানের প্রধান ধর্মীয় নেতা আয়াতুল্লাহ রুহুল্লাহ খোমেনি রুশদির বিরুদ্ধে মৃত্যুদণ্ডের ফতোয়া জারি করেন। ২০২২ সালে নিউইয়র্কে ভাষণ দেওয়ার সময় লেবাননি বংশোদ্ভূত আমেরিকান নাগরিক হাদি মাতার অতর্কিত হামলায় রুশদির একটি চোখ নষ্ট হয়ে যায়।

সম্প্রতি এপার বাংলা ও ওপার বাংলা-- দুই বাংলাতেই ধর্মভিত্তিক অসহিষ্ণুতা বৃদ্ধি পেতে দেখা যাচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গে হিন্দুত্ববাদীদের এবং বাংলাদেশে মুসলিম মৌলবাদীদের নতুন উদ্যমে উৎপাত শুরু হয়েছে। উভয়েই বিধর্মীদের থেকে দূরত্ব বজায় রাখার কথা বলছে। হিন্দুত্ববাদীরা অহিন্দুদের প্রতিমা স্পর্শ এমনকি দর্শনের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করছে। মুসলিম মৌলবাদীরাও ঘোষণা করছে যে, মুসলিমদের জন্য অমুসলিমদের ধর্মোৎসবে অংশগ্রহণ করা হারাম বা নিষিদ্ধ। উভয়েরই বক্তব্য হল, 'ধর্ম যার যার, উৎসব তার তার'। হিন্দুত্ববাদীরা পাঠ্যপুস্তক থেকে আব্বু, আম্মু, বুবু, ফুফু, খালা, আপা, আল্লাহ প্রভৃতি 'ইসলামিক শব্দ' বাদ দিতে চাইছে। মুসলিম মৌলবাদীরাও বাবা, জ্যাঠা, ঠাকুরদা, ঠাকুরমা, প্রণাম, নমস্কার, ঈশ্বর প্রভৃতি 'হিন্দু শব্দ' ব্যবহারের ঘোর বিরোধী। বাংলাদেশের মুসলিম মৌলবাদীরা 'হিন্দু' রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছবিতে কালি লাগাচ্ছে এবং তাঁর রচিত জাতীয় সঙ্গীত বাদ দেওয়ার দাবি তুলছে। এরাজ্যের হিন্দুত্ববাদীরা পাঠ্যপুস্তক, পথ ও প্রতিষ্ঠান থেকে মুসলিমদের নাম বাদ দিচ্ছে। বাংলাদেশের মুসলিম মৌলবাদীরা 'ইসলাম ধর্মের অবমাননা' করার জন্য লেখিকা তসলিমা নাসরিনকে দেশছাড়া করেছে। এরাজ্যের হিন্দু মৌলবাদীরা 'হিন্দু ধর্মকে অপমান' করার জন্য আইনজীবী বিকাশ রঞ্জন ভট্টাচার্যের বাড়িতে হামলা চালাচ্ছে। বাংলাদেশের মুসলিম মৌলবাদীরা সেখানকার হিন্দুদেরকে ভারতে চলে যাওয়ার নির্দেশ দিচ্ছে। আর এরাজ্যের হিন্দুত্ববাদীরা এখানকার মুসলমানদের এক বিরাট অংশের নাম ভোটার তালিকা থেকে ব্যাড দিয়েছে। বিদেশি নাগরিক বলে অনেককে প্রমাণ ছাড়া বাংলাদেশে পুশব্যাক করছে। দুই বাংলাতেই সংখ্যালঘুরা আতঙ্কের মধ্যে দিন কাটাচ্ছে। চোদ্দো পুরুষের ভিটেমাটি ও নাগরিক অধিকার হারানোর ভয় করছে।

ধর্ম নিয়ে উত্তেজনা সৃষ্টির বিপরীতে বাংলার মাটিতে অনেক ঐক্য ও সম্প্রীতির কথা শোনা গেছে। বাংলার হিন্দু ও মুসলিম চিন্তাবিদরা পরস্পরের ধর্মীয় ইতিহাস ও ঐতিহ্য জানতে চেষ্টা করেছেন। তাঁরা ধর্মীয় পরিচয়কে প্রাধান্য না দিয়ে মানুষকে মানুষ হিসেবে দেখার পরামর্শ দিয়েছেন। 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'-এর রচয়িতা কবি বড়ু চণ্ডীদাস (১৩৩৯-১৩৯৯) সেই কবে বলেছেন– 'সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই।' বাংলার নবজাগরণের পথিকৃৎ রাজা রামমোহন রায় (১৭৭২-১৮৩৩) ইসলাম ধর্মের মর্মকথার অনুসন্ধানে ব্রতী হয়ে

লিখেছেন 'তুহফাত-উল-মুয়াহিদ্দীন'। ব্রাহ্মনেতা কেশবচন্দ্র সেন (১৮৩৮-১৮৮৪) ইসলাম ধর্ম নিয়ে চর্চা করে লিখেছেন 'হাফেজ'। ইসলাম-চর্চায় গিরিশচন্দ্র সেন (১৮৩৫-১৯১০) এতটাই নিমগ্ন ছিলেন যে, তিনিই প্রথম বাঙালি হিসেবে কোরআনের বঙ্গানুবাদ করে ফেলেন। গদাধর চট্টোপাধ্যায় অর্থাৎ রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব (১৮৩৬-১৮৮৬) দক্ষিণেশ্বরের ভবতারিণী মন্দিরে নিবিষ্ট চিত্তে যেমন কালী সাধনা করেছেন তেমনি মসজিদে আল্লাহকে ডেকেছেন এবং গির্জায় গিয়ে গড-এর কাছে প্রার্থনা করেছেন। তারপর তাঁর উপলব্ধি হয়েছে--'যত মত, তত পথ'। রামকৃষ্ণের ভাবশিষ্য নরেন্দ্রনাথ দত্ত অর্থাৎ স্বামী বিবেকানন্দ (১৮৬৩-১৯০২) মনে করতেন--'ধর্ম নিয়ে বিবাদ ঠিক খোসা নিয়ে বিবাদের মতো। যখন হৃদয়ের পবিত্রতা ও আধ্যাত্মিকতা বিলুপ্ত হয়, তখন হৃদয় শুষ্ক হয়ে যায় এবং এইরকম ঝগড়ার সূত্রপাত হয়।' তাঁর ধর্মচিন্তার কেন্দ্রে অবস্থান করেছে মানুষ। তিনি ভারতবাসীর অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য নিয়ে ভেবেছেন। তিনি সোজাসুজি বলেছেন, 'খালি পেটে ধর্ম হয় না।' তিনি স্বর্গ-নরকের আধ্যাত্মিক ধারণাকে মহিমান্বিত না করে রুক্ষ বাস্তবের জমিতে নামিয়ে এনেছেন– 'যে ভগবান এখানে আমাকে অন্ন দিতে পারেন না, তিনি যে আমাকে স্বর্গে অনন্ত সুখে রাখবেন, এটা আমি বিশ্বাস করি না।' মানুষের জীবন যন্ত্রণায় বিচলিত হয়ে তিনি বলেছেন-- 'ফেলে দে তোর শাস্ত্র-ফাস্ত্র গঙ্গাজলে। দেশের লোকগুলোকে আগে অন্ন সংস্থান করবার উপায় শিখিয়ে দে, তারপর ভাগবত পড়ে শোনাস।' তিনি বলতে দ্বিধা করেননি– 'প্রার্থনা করার চেয়ে প্রাণ খুলে হাসা অনেক ভালো।' তিনি ধর্মশাস্ত্র অধ্যয়নকে অত্যন্ত জরুরি কাজ মনে করেননি। ভক্তদের উদ্দেশ্যে বলেছেন— 'গীতাপাঠের চেয়ে ফুটবল খেললে তোমরা স্বর্গের আরও কাছে পৌঁছাবে।' 'বৈদান্তিক মস্তিষ্ক ও ইসলামীয় দেহ'-- এই দুইয়ের সমন্বয় সাধনের মাধ্যমেই দেশমাতৃকার মুক্তি ঘটবে বলে তিনি আশাবাদী ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১) স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন,'বাঙালি মুসলমানের সহিত বাঙালি হিন্দুর রক্তের সম্বন্ধ আছে, একথা আমরা যেন কখনও না ভুলি।' কিন্তু তিনি জানতেন ধর্মমোহ এক বিষম বস্তু। তাই তিনি সকলকে সতর্ক করেছিলেন--'ধর্মের বেশে মোহ যারে এসে ধরে, অন্ধ সে জন মারে আর শুধু মরে।' কাজী নজরুল ইসলাম হিন্দু ও মুসলমানকে 'এক বৃন্তে দুটি কুসুম' হিসেবে দেখেছেন। তিনি তাঁর রচনায় বারবার মনুষ্যত্বের জয়গান গেয়েছেন। তিনি বিশ্বাস করতেন, ধর্ম কখনও মানবিকতার থেকে বড় হতে পারে না। তাই লিখেছেন,'মিথ্যা শুনিনি ভাই,/এই হৃদয়ের চেয়ে বড় কোনো মন্দির কাবা নাই।'

কোনো ধর্মগ্রন্থে ধর্ম নিয়ে বাড়াবাড়ি করার কথা বলা হয়নি। গোঁড়া ধর্ম-সংগঠক ও সাম্প্রদায়িক রাজনীতির কারবারিরা নিজেদের স্বার্থে এটা করে। ধর্ম পালন করার জন্য উগ্র হওয়ার দরকার হয় না। কিন্তু কায়েমী স্বার্থ রক্ষায় হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করার জন্য ধর্ম নিয়ে গরম গরম কথা বলার প্রয়োজন পড়ে। তুচ্ছ কারণে মানুষকে ক্ষেপিয়ে তুলতে ধর্মের থেকে কার্যকর অস্ত্র আর নেই! মানুষকে ধর্মের মোহ থেকে মুক্ত হতে হবে। ধর্মীয় আবেগ যেন যুক্তিবোধ ও বিবেকবোধকে অতিক্রম করতে না পারে, সে ব্যাপারে সতর্ক থাকতে হবে। মৌলবাদ ও সাম্প্রদায়িকতার বিপদ সম্পর্কে আমরা সবাই অবগত। অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নিতে হবে। রোজা-পূজা অথবা মন্দির-মসজিদ, এককথায় ধর্মকে রাজনৈতিক ইস্যু হতে দেওয়া যাবে না। সাধারণ মানুষের মুক্তচিন্তা ও সচেতনতার মধ্যেই ধর্মকেন্দ্রিক সমস্যার সমাধান রয়েছে।

(লেখক মুর্শিদাবাদের কাবিলপুর হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক)

বিভেদের বিষবৃক্ষ ও সমন্বয়ের পথ

মনীষা বন্দ্যোপাধ্যায়

বিভেদের বিষবৃক্ষ আজ ভারতের সামাজিক জীবনে নতুন করে মাথা তুলেছে;খাদ্য, পোশাক, বিবাহ কিংবা উৎসবকে ঘিরে মানুষকে ভাগ করার রাজনীতি চলছে। অথচ চৈতন্য, চণ্ডীদাস, লালন, রবীন্দ্রনাথ ও নজরুলের বাংলা সবসময়ই সমন্বয়ের পথ দেখিয়েছে। গান্ধীর অহিংস মানবতাবোধ থেকে আজ শিখতে হবে, বিশ্বাসের বদলে সহমর্মিতা, বিদ্বেষের বদলে মৈত্রীই পারে সমাজকে রক্ষা করতে।

প্রথম সারির দৈনিকের প্রথম পাতার কোণের খবর- গোমাংস খাওয়ায় সহপাঠীদের লাগাতার কটাক্ষ ও মারধরের শিকার হওয়ার অভিযোগ উঠেছিল। সেই অপমান সহ্য করতে না পেরে আত্মঘাতী হল আকিলান নামে একাদশ শ্রেণির এক পড়ুয়া। তামিলনাড়ুর কোয়ম্বোত্তুরের এই ঘটনায় দুই পড়ুয়া ও দুই শিক্ষকের বিরুদ্ধে আত্মহত্যায় প্ররোচনাসহ একাধিক ধারায় অভিযোগ দায়ের হয়েছে।

এই খবরগুলো স্থান কাল পাত্র বদলে বদলে প্রায় প্রতিদিনই সংবাদমাধ্যমে পাওয়া যায় এবং এই হল আমাদের আজকের ভারতের

নমুনা। একটি ছোট খবরই অনেকগুলো কথা বলে দেয়। প্রথম কথাটা অবশ্যই গোমাংস সম্পর্কিত। বেশ কিছুকাল যাবত এদেশে কে কী খাবে, কে কী পড়বে তা নিয়ে ভালো রকম উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছে। গোমাংস নিয়ে নানা রকমের বিতৃষ্ণা কিছু হিন্দুদের মধ্যে আছে। তবে এরও রকমফের আছে। গোবলয়ের উচ্চ বর্ণীয় হিন্দুদের প্রতাপে আমিষ খাওয়া নিয়েই এখন নানা রকমের সমস্যা। এখন তার সাথে রাজতন্ত্র জুড়ে গেছে অর্থাৎ সরকারিভাবে গোমাংস নিয়ে নানা রকম প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয়েছে, যদিও এদেশে সবচেয়ে বড় গোমাংস রপ্তানিকারক কোম্পানির মালিক নিরামিষাসী হিন্দু। বাংলাতেও নব্য হিন্দুদের রাজত্ব শুরু হওয়ার পর থেকেই কুরবানীতে গোহত্যা নিয়ে প্রতিবন্ধকতা তৈরি হয়েছিল। তার আগে অর্থাৎ নির্বাচনের আগে সাময়িক উত্তেজনা সৃষ্টি করার জন্য একজন সবর্ণ হিন্দু ব্রাহ্মণ সন্তান একটি দোকানে গিয়ে তাকে গোমাংস খাওয়ানো হচ্ছে বলে একজন মুসলমান কর্মচারীকে হেনস্থা করেন ও তাকে জেলে পাঠান। সম্প্রতি জানা গেছে যে এই কাজটি করার জন্য তিনি যথেষ্ট টাকা-পয়সা পেয়েছেন। অর্থাৎ কিনা ধর্ম এবং তার আচরণ সবই অর্থের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত।

সাম্প্রদায়িকতা সবসময়ই আছে কিন্তু আমরা এটাই শিখেছিলাম যে সাম্প্রদায়িকতা একটি অপরাধ। জাতি ধর্ম-বর্ণ লিঙ্গ বা যেকোনো ধরনের পরিচিতির কারণেই মানুষকে নিগৃহীত করা একটি দণ্ডনীয় অপরাধ। এদেশের আইনও সেরকম বলে। প্রথমত যেকোনো ধরনের নিগ্রহই অপরাধ, ফলে যারা ধর্মনিরপেক্ষতাকে গালি দেওয়ার জন্য এক্ষেত্রে পক্ষ নিয়ে থাকেন তাদের অবস্থানটি খুবই গোলমেলে। কিন্তু আজকের ভারতে রাষ্ট্র পোষিত সাম্প্রদায়িকতা সমাজের সবখানে ছড়িয়ে গেছে, ক্যান্সার রোগের মত এর প্রতিকার খুঁজে পাওয়া মুশকিল।

শুধু মুসলমান নয়, খ্রীষ্টানরাও নির্যাতিত। গির্জার উপর আক্রমণ তো আছেই। এ বছর দুর্গাপুজোর সময় পশ্চিম মেদিনীপুরের চন্দ্রকোণায় খ্রিষ্টান পরিবারদের জবরদস্তি মন্ডপে নিয়ে যাওয়া, অঞ্জলি দিতে জোর করার মতো ঘটনা ঘটেছে। তার উপর মারধোর। ২০২৬ সালের ১৩ মে থেকে ২০ সেপ্টেম্বরের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের ১৩ টি জেলায় খ্রিস্টানদের উপর আক্রমণের অন্তত ৬০ টি অভিযোগ এসেছে।

পশ্চিমবঙ্গে ক্ষমতা পরিবর্তনের পর নব্য হিন্দু সরকার এরকম নমুনা সব দিকে দেখিয়ে যাচ্ছেন। গ্ধ যদিও সংবিধান মেনেই তারা শপথ নিয়েছেন কিন্তু প্রত্যেকদিনই তারা সংবিধান উলঙ্ঘন করার ভুরি ভুরি দৃষ্টান্ত দিয়ে যাচ্ছেন। দেশের প্রধানমন্ত্রী তথা প্রধান সেবক অবশ্য 'হিন্দু খতরেমে' বলেই যাচ্ছেন অথচ সে বিপদ তিনি বারো বছরেও কাটাতে পারেননি। এদিকে এ বছর দুর্গাপূজাটাই খানিকটা পানশে হয়ে গেল কারণ ভয়ে পুরোহিতরা মন্ত্র পাঠে এতই তটস্থ হয়েছিলেন যে, সেই দল বেঁধে অঞ্জলি দেওয়াটাও কেমন যেন অন্যরকম হয়ে গেল। ওদিকে পাশের 'জেহাদি' রাষ্ট্র বাংলাদেশে এ বছর এত আনন্দের সাথে আপামর জনসাধারণ দুর্গোৎসবে যোগ দিয়েছেন, যা দেখে তাক লেগে যাবে।

বিগ ব্রাদার বা বড়দার ভয় এখন সবখানে।

হঠাৎ করে স্কুলে ঢুকে পড়ছেন শিক্ষক সংগঠন। এরাও নব্য হিন্দু ক্যাডার।এসেই তারা আস্ফালন করছেন যে কিছু ছাত্রী কেন হিজাব পরে আসছে। তারপরেই তারা নিদান দিচ্ছেন যে শ্যামাপ্রসাদের ছবি লাগাতে হবে। তারপরে উপস্থিত শিক্ষিকা শিক্ষকের সামনে যাদের মধ্যে সব ধর্মের মানুষ আছেন, সেখানে ঘোষণা করছেন যে আর কোন তোষণ চলবে না। প্রয়োজনে প্রধান শিক্ষককে তর্জনী তুলে বলে যাওয়া হচ্ছে যে মুসলমানদের মাথায় তোলা চলবে না। লেখাপড়া? না না সে নিয়ে কারো মাথাব্যথা নেই। আর্থ - সামাজিক পরিস্থিতি বিচার করলে অবশ্য মুসলমানদের কেউ মাথায় তুলেছেন বলে মনে হয় না।

এরপরই এসে যাচ্ছে নব্য হিন্দুদের সবচেয়ে প্রিয় বিনোদন, সেটি হল লাভ জেহাদিদের খুঁজে বের করা। কে না জানে দুনিয়ায় ভালোবাসার কারণেই ভিন্ন ভিন্ন মানুষে সেতু বাঁধা হয়েছে বারবার। কিন্তু এই ভালোবাসা বিরোধী সংগঠনগুলি ভালোবাসার সাথে জিহাদ শব্দটিকে যুক্ত করেছে যার কোন অর্থ তারা নিজেরা জানে না, এখন পাড়ায় পাড়ায় নজরদারি চলছে। উত্তরপ্রদেশে শুনেছি ম্যারেজ রেজিস্টার অফিসের সামনে বজরংদলের লোকেরা দাঁড়িয়ে থাকে। কে কাকে বিয়ে করছে তাদের জাত পাত ধর্ম বর্ণ সব তাদের জানা দরকার। ভোট দেওয়ার বয়স যাই হোক না কেন বিয়ের ব্যাপারে তখন তারা সনাতনী প্রথায় বাপ মায়েদের ডাকাডাকি করতে শুরু করেন।

আমরা কি রামমোহন, বিদ্যাসাগর, রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, রোকেয়ার উত্তরাধিকারকে বিস্মৃত হলাম? না কি আমরা তাদের কোনোদিনই স্বীকার করিনি! কিন্তু এই বাংলারই লোকায়ত পরম্পরার ধারায় যে আধ্যাত্মিক সাধন প্রণালী বহমান সেখানে তো বিদ্বেষ নেই। জন্মসূত্রে ব্রাহ্মণ চৈতন্যদেব যা ভেঙেছিলেন এত বছর আগে, তাকেই পরবর্তীতে একেবারে নিশ্চিহ্ন করতে পেরেছিলেন মহাত্মা লালন ফকির তাঁর সহজ সাধনায়। এরই মাঝে মানবাধিকারের শ্রেষ্ঠ বার্তা দিয়ে গেছেন চন্ডীদাস, সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই। এরপরেও আমাদের কি দুর্বিপাক হল, এটা বোঝা দরকার।

হ্যাঁ,এদেশে বিদ্বেষের রাজনীতির অন্যতম শিকার বাংলা। বহু হতাহতের রক্তের উপর আমরা দ্বিখণ্ডিত হয়েছি, সে শোক আমাদের আছে। কিন্তু ইতিহাসের পাতা থেকে শুধু সেটুকুই মনে রাখতে হবে অথবা মনে রাখাতে হবে যা আজ করা হচ্ছে। কেমন করে পূজা মন্ডপে শোভা পায় একই সাথে গান্ধী এবং গডসে ২০২৬ সালে, কেনই বা গোপাল পাঁঠা মহানায়ক হয়ে ওঠেন! আমরা কি পাকিস্তান থেকে বেরিয়ে আসা বাংলাদেশের লড়াই দেখিনি! ধর্মভিত্তিক বিভাজনের ইতিহাসকে যা মিথ্যা বলে প্রমাণ করেছিল। ভাষা এবং সংস্কৃতি জাতির কাছে কত গুরুত্বপূর্ণ সে কথাও তো আমরা জেনেছি। পঞ্চাশ বছরের শিক্ষা আজ ভুয়ো প্রচারে আর নকলনবিশীতে ধ্বংস হয়ে যাবে? উপমহাদেশের রাজনীতি কখনোই ধর্মমুক্ত ছিল না। দেশপ্রেমের সুরটি বাঁধা হয়েছিল ধর্মে। রবীন্দ্রনাথ এই মাতৃবন্দনার বিপদ তুলে ধরেছিলেন ঘরে বাইরে উপন্যাসে।

ধর্ম এবং রাজনীতিকে ঠিক কীভাবে মিশিয়ে ধর্মরাজ্য স্থাপন করা যায় তার সূত্র দিয়েছিলেন সাভারকর। দ্বিজাতিতত্ত্বের প্রবক্তা সাভারকর ভেবেছেন ধর্মের ভিতরের যে সত্যটুকু পরস্পরের সাথে জুড়ে রাখে তাকে বিলুপ্ত করে স্বতন্ত্র হওয়ার সাধনাই রাজনীতি। নেহরু বলেছিলেন স্বাধীন ভারতে তার কাছে অন্যতম কঠিন কাজ দেশকে ধর্মনিরপেক্ষ করে তোলা।

পাশাপাশি সাম্প্রদায়িকতা প্রশ্নে গান্ধীর অবদান নিয়ে আজ সবচেয়ে বেশি চর্চা প্রয়োজন। কেননা রাজনীতিবিদ হিসেবে গান্ধী সেই এক জন যিনি ধর্ম নিয়ে কঠিন পরীক্ষায় যেতে পেরেছিলেন যার উদ্দেশ্য ধর্মান্ধতা নয়, সহিষ্ণুতা প্রতিষ্ঠা। ধর্মকে এড়িয়ে যে রাজনীতি, গোটা পৃথিবীতেই তা ব্যর্থ হয়েছে। কেননা ধর্মীয় উন্মাদনাই একমাত্র জনসাধারণকে সর্বাংশে বেশি নিষ্ঠুর ও অসহিষ্ণু করে তুলতে পারে। সে তখন শুধুই মারে আর মরে। এই মৃত্যু উপত্যকায় অকুতোভয়ে দাঁড়াতে পারতেন গান্ধী। সাতাত্তর বছর বয়সে জরাজীর্ণ দেহ নিয়ে তিনি গিয়েছিলে নোয়াখালী। কোন পুলিশ , কোনও সেনার ছত্রছায়ায় নয়, গুটিকয়েক সঙ্গী নিয়ে। বিধ্বস্ত , আক্রান্ত গ্রামগুলিকে পায়ে হেঁটে ঘুরেছেন। মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছেন। থেকেছেন দুই ধর্মের মানুষের ঘরে। এমন নিদারুণ পরিস্থিতিতেও যে মৈত্রীর দীপ জ্বলতে পারে, গান্ধী তা দেখিয়েছেন।

এই প্রসঙ্গে অমর্ত্য সেনের আত্মজীবনীতে কথিত ক্ষিতিমোহনের একটি বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য।

'আমার মনে আছে, ক্ষিতিমোহন কতটা হতাশ হয়েছিলেন, যে হিন্দু-মুসলমানের বহু শতাব্দীর যুক্তসাধনার ধারাটি কংগ্রেস নেতৃত্বের কাছে বিন্দুমাত্র গুরুত্ব পেল না, দুই গোষ্ঠীর পরস্পর সম্পর্কে নিষ্ক্রিয় সহনশীলতার গন্ডি ছাড়িয়ে তাঁরা ভাবতেই পারলেন না। ক্ষিতিমোহন আমাকে বারবার বলতেন,'একসঙ্গে শান্তিপূর্ণভাবে বাস করার থেকেও অনেক বেশি কিছু আছে এই ভারতে, যাকে আমরা একযোগে নির্মাণ করেছি।' (জগৎ কুটির, অমর্ত্য সেন, প্রতিরোধ ও বিভাজন পৃ ১৬৮)

রাজনীতির আঙিনায় এই সমন্বয় সাধনাকে অনুশীলন করেছেন হিন্দুত্ব বাদের প্রধান প্রতিপক্ষ মহাত্মা গান্ধী। গান্ধী ধর্ম ও রাজনীতিকে আলাদা করেননি, তাঁর সব কাজের উৎস যে নীতি তা তিনি ধর্ম থেকেই পেয়েছিলেন। তাঁর অহিংসা ও সত্য যা পর্বতের মত প্রাচীন, তাঁকে বুঝিয়েছিল ঈশ্বর ও আল্লা এক। রাম একা মর্যাদা পুরুষোত্তম, কিন্তু গান্ধীর সীতারাম পতিত পাবন। গান্ধীর আশ্রমে সকালে ও বিকালে প্রার্থনা হত বিভিন্ন ধর্ম থেকে। গান্ধীর সমন্বয়ী ভাবনাই বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীর দেশকে এক ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক সংবিধানের দিকে নিয়ে গেছে। নাহলে হিন্দুত্ববাদীদের স্বপ্ন অনুযায়ী এটিও ধর্মীয় রাষ্ট্র হতো।

আমাদের পথ কী? মনে হয় নিরন্তর সত্য বলে চলা। যে সত্য চিরন্তন, যা মিলনের কথা বলে, ভালোবাসার কথা বলে।গ্ধ সাম্প্রদায়িক শক্তিকে প্রতিহত তেকরার উদ্যোগে সব স্তরের মানুষকে যে যেখানে আছেন এই সমন্বয়ী সংস্কৃতির কথা বলে যেতে হবে কোথাও চৈতন্য, কোথাও চন্ডীদাস, কোথাও লালন এবং অবশ্যই রবীন্দ্রনাথ ও নজরুল।

গোটা দেশের কথা জানা নেই, কিন্তু বাংলায় এই বিভেদের বিষবৃক্ষ উৎপাটন করতে গেলে নিরন্তর সমন্বয়ী চর্চা প্রয়োজন। ইস্কুলের প্রত্যেকটি নতুন বই এর প্রথম পাতায় সংবিধানের প্রস্তাবনা ছাপা থাকে। যারা পড়াবেন তারা ঐ পাতাটি অবহেলায় উল্টে দেন। পরস্পরকে জানার ও বোঝার বহু উদ্যোগ নেওয়া যায় অনায়াসে, সমন্বয়ী সংস্কৃতির উদাহরণ নিজের এলাকায় খুঁজে দেখা যায়।

এখন হয়তো খুব ছোট ছোট করে কিছু প্রচেষ্টা আমাদের বাঁচাতে পারে, গান্ধী যেমন বলতেন। কিন্তু তার শুরু হোক ব্যক্তিগত স্তর থেকে। গান্ধীর সাথে নারীবাদী আপ্তবাক্যটি বেশ মিলে যায়। ব্যক্তিগতই রাজনৈতিক। আর সেখানে সুরটি যেন বাঁধা হয় সমন্বয়ের। ১৯৮৯ সালে ভাগলপুরে দাঙ্গার পর বেশ কিছুদিন সেখানে সম্প্রীতির বার্তা নিয়ে কিছু মানুষ যেতেন লেখক সাংবাদিক গৌরকিশোর

ঘোষের উদ্যোগে। অসম্ভব সম্ভব হয়েছিল সেখানে। যুযুধান দুই পক্ষ মুখোমুখি বসেছিল। মহল্লায় মহল্লায় শান্তি কমিটি তৈরি হয়েছিল। ৩৬ বছর পরেও যে সম্প্রীতি বজায় আছে। ২০২৫ সালে ওয়াকফ আইন সংশোধনকে কেন্দ্র করে মুর্শিদাবাদের একটি অংশে সাম্প্রদায়িক সমস্যা হয়। প্রাণহানি, সম্পত্তি ধ্বংস সবই হয়। বিষয়টা গোদি মিডিয়া দ্বারা অতিরঞ্জিত হয়ে ভয়ানক উত্তেজনা তৈরি করে। সেখানেও দেখা গেছে কিছু মানুষের শুভবুদ্ধি ও সহমর্মিতা পরিস্থিতি স্বাভাবিক করতে সাহায্য করেছে। এই প্রয়াসই একমাত্র পথ।

'কিন্তু মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারানো পাপ, সে বিশ্বাস শেষ পর্যন্ত রক্ষা করব। আশা করব, মহাপ্রলয়ের পরে বৈরাগ্যের মেঘমুক্ত আকাশে ইতিহাসের একটি নির্মল আত্মপ্রকাশ হয়তো আরম্ভ হবে এই পূর্বাচলের সূর্যোদয়ের দিগন্ত থেকে।' কবির এই কথাটি যেন আমাদের ভরসা দেয়।

(লেখিকা বীরভূম জেলার লাভপুর সত্যনারায়ণ শিক্ষানিকেতন গার্লস হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা)

ফিরে দেখা

কলকাতা বেতারের শতবর্ষ : প্রথম যুগের চ্যালেঞ্জ

ভবেশ দাশ

১৯৩৯ সালের ১৭ জানুয়ারি কলকাতা বেতারের অস্থায়ী অধিকর্তা অশোক সেন শ্রোতাদের উদ্দেশে একটি ভাষণ দিয়েছিলেন। তখনকার দিনে ভাষণ বা কথিকা প্রচারকে বলা হতো 'বক্তৃতা'। বেতারে এটাই ছিল চালু শব্দ। সেই বক্তৃতায় তিনি বলেছিলেন: 'আপনাদের কাছে মাঝে মাঝে আমাকে নিজেকেই আসতে হয়। তার জন্য হয়তো আপনারা খুশি হয়ে ওঠেন না। কারণ আমাদের কথা শোনার চেয়ে গান-বাজনা শুনতে আপনাদের ভালোলাগাই স্বাভাবিক। তবু কর্তব্যের খাতিরে দু-একটা কথা না বললে, আমাদের অপরাধ আরও বেড়েই চলবে। যদি কোন দোষ হয়, তাহলে আপনাদের কাছ থেকে ক্ষমা পাব, এ ভরসা রাখি।'

সেদিনের বক্তৃতায় তিনি শ্রোতাদের রুচিভেদের কথা বলেছিলেন। অনুষ্ঠান ভালো লাগা, অথবা না-লাগা নিয়ে শ্রোতারা তখন যেসব চিঠি পাঠাতেন, তার মধ্যে অনুষ্ঠানের সমালোচনা এবং প্রশংসা দুটোই ছিল। এটা অবশ্য নতুন কোনো কথাই নয়। আজও আকাশবাণীর শ্রোতারা যখন চিঠি লেখেন, তাঁদের কথাতে নানা প্রসঙ্গের মধ্যে রুচিভেদের কথাটাও থাকে। সব অনুষ্ঠান সকলের ভালো লাগে না। লাগার কথাও নয়। ভিন্ন রুচির অধিকার তো মানতেই হবে।

কিন্তু সেইদিন আর এইদিনের কথার তাৎপর্য এক নয়। যেদিন অশোক সেন শ্রোতাদের উদ্দেশে ভাষণ দিয়েছিলেন, কলকাতা বেতারের বয়স তখন বারো বছর হয়ে গেছে। রেডিয়ো নামক জনসংযোগের এই মাধ্যমটি সম্পর্কে সকল শ্রোতার বিস্ময়ের ঘোর তখনও সম্পূর্ণ কাটেনি। দিনে দিনে শ্রোতাদের প্রত্যাশাও বেড়ে যাচ্ছে অনেকখানি। যদিও শ্রোতাদের অনেকেরই সাধ্য হয়নি রেডিয়ো কেনার। তার ওপর রেডিয়ো লাইসেন্সের ব্যাপারে ছিল সরকারের কড়া নজরদারি। বিনা লাইসেন্সেস রেডিয়ো শোনার জন্য পুলিশের ধরপাকড়ও ছিল। মামলাও হয়েছে অনেক। সেইসঙ্গে একথাও ঠিক শ্রোতাদের কাছে রেডিয়ো আরও জনপ্রিয় করে তুলতে হলে অনুষ্ঠানের বৈচিত্র্য ও তার মান অনেক উন্নত করতে হবে। অতএব সেটা একটা চ্যালেঞ্জ। তখনকার দিনে এই চ্যালেঞ্জটা মাথা পেতে নিয়েছিলেন বেতারের সকল কলাশিল্পী ও কলাকুশলী।

এদিনের সঙ্গে সেদিনের তুলনা করতে গিয়ে মনে রাখতে হবে আরেকটা কথাও। এই যে ১৯৩৯ সালের কথা বলছি, সেইসময়ে কলকাতা বেতারে অনুষ্ঠান সম্প্রচারিত হতো মিডিয়াম আর শর্ট ওয়েভে। রবিবার বাদে প্রতিদিন রেডিয়ো চালু হতো দুপুরের অধিবেশন দিয়ে। বলা হতো 'দ্বিপ্রাহরিক অনুষ্ঠান' আর 'সান্ধ্য অনুষ্ঠান'। শুধু রবিবারে থাকত 'প্রাতঃকালীন অনুষ্ঠান' আর 'সান্ধ্য অনুষ্ঠান'। দুপুরের অধিবেশন নেই। এর মধ্যে আবার কোনো কোনো দিন মিডিয়াম ওয়েভের অনুষ্ঠানই একযোগে শর্ট ওয়েভেও চালানো হতো। এই দুটি মাত্র চ্যানেলের জন্যই তখন রেডিয়োর কর্তাদের হিমশিম খেতে হচ্ছে। গান-বাজনার শিল্পী জোগাড় করা, বিষয় অনুযায়ী বিশেষজ্ঞ বক্তার সন্ধান করা, নাটকের আয়োজন, তার জন্য শিল্পী বাছাই, উঁচুমানের শিল্পীদের গান-বাজনার রেকর্ড সংগ্রহ করা; এমন কাজের অন্ত নেই।

এ কাজ বেতারের অন্দরে যুক্ত সকলকেই কম-বেশি করতে হয়। কিন্তু প্রযুক্তির কল্যাণে তার চরিত্রটাই এখন বদলে গেছে। কাজ সহজতর হয়েছে। আবার জটিলতর মনে হতে পারে কারও কারও। কিন্তু তার কারণ আলাদা। আর সূচনার সেই বছরগুলিতে বেতারের

জনপ্রিয়তার জন্য এই প্রয়োজনের সঙ্গে যুক্ত সকলকে অক্লান্ত পরিশ্রম করতে হয়েছে, প্রতি মুহূর্তে উদ্ভাবনের পরিচয় দিতে হয়েছে, যেকোনো অনুষ্ঠানের জন্য ঝুঁকি নিতে হয়েছে অনেকখানি। তাঁদের সর্বক্ষণের ধ্যানজ্ঞান ছিল রেডিয়োর জনপ্রিয়তা ক্রমাগত বাড়ানো।

যদি প্রথম বারো বছরের কথাই বলি, তাহলে দেখব শুরুতেই পাঁচ-ছয় মাসের মধ্যে যাঁরা বেতারে যোগ দিয়েছেন, তাঁরাই কলকাতা বেতারের কাণ্ডারী হয়ে উঠেছেন। এঁদের মধ্যে ছিলেন নৃপেন্দ্রনাথ মজুমদার, রাইচাঁদ বড়াল, বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র, রাজেন সেন, যোগেশচন্দ্র বসু, নলিনীকান্ত সরকার, হীরেন বসু, সুরেশ চক্রবর্তী, বাণীকুমার, পঙ্কজ মল্লিকের মতো মানুষজন। বেতারের আঙিনাতেই তাঁরা হয়ে উঠেছেন এক-একজন দিকপাল। বেতারেই তাঁদের স্বশিক্ষা, বেতারেই প্রতিভার উচ্চতাকে তাঁরা স্পর্শ করেছেন। কারণ মাধ্যম হিসেবে রেডিয়ো তখন সকলের কাছে একেবারে নতুন। বরং যাঁর বক্তৃতার টুকরো দিয়ে লেখা শুরু করলাম, সেই অশোক সেন কিছুদিন বিবিসি-তে প্রশিক্ষণের সুযোগ পেয়েছিলেন। কিন্তু সে তো প্রশিক্ষণ, দীর্ঘকালীন কাজের অভিজ্ঞতা তো নয়। আর তা ছাড়া আশোক সেন রেডিয়োর পারফরমার নন। তিনি একজন উচ্চপদস্থ আধিকারিক। এঁদের মধ্যে সংগঠিতভাবে কলকাতা বেতার শুরু হবার আগে কিছুটা কাজের অভিজ্ঞতা হয়েছিল হীরেন বসুর। গানে, অভিনয়ে, নাটক ও গান লেখায়, সংগীত পরিচালনায় তিনি ছিলেন এক অনন্য মানুষ। ভারতে সম্প্রচার কতটা বাণিজ্যিকভাবে সফল হতে পারে, তার একটা পরীক্ষামূলক উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল ১৯২৬ সালে। হাইকোর্টের কাছে টেম্পল চেম্বারের একেবারে উপরের তলায় একটি স্টুডিয়ো তৈরি করা হয়, সেখান থেকে সীমিত সময়ের জন্য কিছু অনুষ্ঠান প্রচার হতো। তার মধ্যে নাটক, আবৃত্তি, গান সবই ছিল। এই সম্প্রচার কাজের জন্য বিবিসি থেকে এসেছিলেন সি. সি. ওয়ালিক। তিনি পরে কলকাতা বেতারের প্রথম অধিকর্তা নিযুক্ত হন। টেম্পল চেম্বারের ওই অস্থায়ী সম্প্রচারকেন্দ্রের চালক ছিলেন জে. আর. স্টেপ্টলটন। তিনিই আবার পরে কলকাতা বেতারের দ্বিতীয় অধিকর্তা হয়ে আসেন। তিনি এই দায়িত্বে ছিলেন অনেকদিন। প্রায় বারো-তেরো বছর। স্টেপ্টলটন সেই সময়ে দুই নৌকায় পা দিয়ে চলতেন। কলকাতা বেতারের কাজের ফাঁকে তিনি কিছু সময় আবার ইন্ডিয়ান ব্রডকাস্টিং কোম্পানির অন্য অফিসে গিয়েও কাজ করতেন।

এ ছাড়া পরীক্ষামূলক বেতার সম্প্রচারের আর একটা উদ্যোগ নিয়েছিলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক ড. শিশিরকুমার মিত্র। তিনি ট্রান্সমিটার বসিয়েছিলেন গবেষণাগারে। টেম্পল চেম্বার এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণাগার;দু-জায়গাতেই অনুষ্ঠান করেছেন হীরেন বসু। মনে রাখতে হবে, নৃপেন মজুমদার এবং রাজেন সেন ছাড়া অন্য কেউই প্রথম দিনে বেতারে যোগ দেননি। তারপর অল্পকালের মধ্যে সকলে একে একে এসেছেন বেতারে। কিন্তু সকলেরই যোগদানের ব্যাপারটা ঘটেছে এক থেকে দেড় বছরের মধ্যে।

বেতারকে জনপ্রিয় করতে তাঁদের উদয়াস্ত পরিশ্রম এমনই পর্যায়ে চলে গিয়েছিল যে, এই সময়ের মধ্যে সকলের মিলিত চেষ্টায় সেরা শিল্পীদের সমাবেশ তো ঘটানো হলোই, চালু হলো সংগীত শিক্ষার আসরও। পঙ্কজ মল্লিকেরও আগে এই সংগীত শিক্ষার আসরের সূচনা করেছিলেন রাইচাঁদ বড়াল। শাস্ত্রীয় সংগীত শিক্ষার আসর শুরু করেছিলেন কৃষ্ণচন্দ্র দে, যদিও তা অল্পদিনের জন্য। আবার গিরিজাশঙ্কর চক্রবর্তীও 'রাগসংগীতের আসর' কিছুকাল পরিচালনা করেন। প্রকাশিত হলো বেতারের নিজস্ব পত্রিকা 'বেতার জগৎ' (সেপ্টেম্বর ১৯২৯)। উদ্ভাবন করা হলো আজ প্রায় শতবর্ষছোঁয়া কালজয়ী অনুষ্ঠান 'মহিষাসুরমর্দিনী'। সে এমনই অনুষ্ঠান, যার শিল্পী ও কলাকুশলী নির্বাচনে সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণতা এতটুকু স্থান পায়নি।

এই সময়কালেই রবীন্দ্রনাথের জন্মদিনে (৭৮তম) কবিকণ্ঠে তাঁর লেখা 'জন্মদিন' কবিতা সরাসরি সম্প্রচার করা হলো (৮ মে ১৯৩৮) সারা দেশে। পরের বছর পুরীতে গিয়ে তাঁর কণ্ঠে কবিতা ও গান রেকর্ড করা হলো। সেই বছরেই ঢাকা রেডিয়োর উদ্বোধন (১৬ ডিসেম্বর ১৯৩৯) উপলক্ষে জোড়াসাঁকোয় গিয়ে কবিকণ্ঠে কবিতা (বাংলা ও ইংরেজি) রেকর্ড করা হয়েছিল। এই সময়ে রবীন্দ্রনাথ অসুস্থ থাকলেও বেতারের জন্য লিখলেন ১৬ পঙক্তির কবিতাঙ্ক 'ধরার আঙিনা হ'তে ঐ শোনো উঠিল আকাশবাণী'। আবার এই সময়কালেই বেতারে কিছু শিল্পীর গাওয়া তাঁর গান সুগীত হচ্ছে না বলে তিনি ক্ষোভ প্রকাশ করেন। কিন্তু বেতারের সঙ্গে সুসম্পর্কের ক্ষেত্রে তিনি তাঁর ক্ষোভকে একমাত্র করে রাখেননি। এরই কাছাকাছি সময়ে আরও একটি ঘটনা ঘটেছিল।

বেতার শুরু হওয়ার কিছুকাল পর থেকেই রবীন্দ্রনাথের গান নিয়মিতই পরিবেশিত হচ্ছিল। এই সময়, সম্ভবত তিরিশের দশকের মাঝামাঝি সময়ে, বিশ্বভারতী বেতারে প্রচারিত রবীন্দ্রনাথের গানের মালিনকানা দাবি করলেন। এ ধরনের দাবি এই প্রথম বলে এই ব্যাপারে মীমাংসা করতে গিয়ে দেড় বছর সময় লেগে গেল। এদিকে মীমাংসার অপেক্ষায় রেডিয়ো থেকে রবীন্দ্রসংগীত প্রচারও দেড় বছরের মতো বন্ধ রইল। আশ্চর্যের বিষয়, এজন্য একজন শ্রোতাও

একদিনের জন্য অনুযোগ জানাননি। রবীন্দ্রসংগীতের বর্তমান বহুল প্রচারের দিনে এই ঘটনার মধ্যে অনেকখানি চিন্তার খোরাক খুঁজে পাওয়া যাবে। বহু শ্রবণ যে অনুকূল রুচির সৃষ্টি করে তারও প্রমাণ এর মধ্যে পাওয়া যায়।;এই উপলব্ধির কথা বলেছেন কলকাতা বেতারে তখনকার দিনের সংগীত বিভাগের প্রধান সুরেশ চক্রবর্তী। তিনি বোঝাতে চেয়েছেন নিয়মিত বা প্রতিদিন রবীন্দ্রগান পরিবেশনের মধ্যে দিয়ে শ্রোতাদের যে কান তৈরি হতো পারত, তা ব্যাহত হলো। সেই জন্য রবীন্দ্রসংগীতের অভাব শ্রোতারা সেইভাবে তখন অনুভব করেননি। পরবর্তীকালে আমরা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় দেখব, ব্রিটিশ সরকার নানারকম সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের পরিবর্তে রাজনৈতিক প্রচারেই তখন রেডিয়োকে বেশি ব্যবহার করেছে। রবীন্দ্রনাথের গান সম্প্রচারে প্রথম বারো বছরের মধ্যে যে-সমস্যাই দেখা দিক না কেন, রবীন্দ্রনাথের জন্মদিন উপলক্ষে বিশেষ অনুষ্ঠান, জোড়াসাঁকো থেকে কবি-অভিনীত 'তপতী' নাটকের সরাসরি সম্প্রচারের কাজ বেতার করেছে। সেটা তো ঘটেছিল ১৯২৯ সালের ২৮ সেপ্টেম্বর। সেই রবীন্দ্রগান প্রচারের সময় 'উচ্চাঙ্গ রবীন্দ্রসংগীত', 'রবীন্দ্রনাথের ভক্তিগীতি';এরকম ঘোষণাও শোনা গেছে। এমন উল্লেখ আমরা 'বেতার জগৎ'-এ পাই। তবে এমনটা বেশিদিন চলেনি। পরে 'রবীন্দ্রসংগীত' শব্দটাই ঘোষণায় বেশি বলা হয়েছে।

পঙ্কজ মল্লিকের সংগীত শিক্ষার আসরে রবীন্দ্রসংগীত প্রাধান্য পেয়েছে তা আমরা জানি। কিন্তু বাণীকুমার, অজয় ভট্টাচার্য থেকে মীরার ভজন অনেকের বাণীতে সুর দিয়েও তিনি শিখিয়েছেন শিক্ষার্থীদের। বাণীকুমারের কিছু গানের হিন্দি অনুবাদও তিনি শিক্ষার্থীদের গলায় তুলে দিয়েছেন। যদিও শ্রোতাদের মধ্যে লঘুসংগীতের প্রতি আগ্রহ ছিল বেশি। কিন্তু রাগসংগীতকে রেডিয়ো শুরু থেকেই গুরুত্ব দিয়ে এসেছে। ইচ্ছে করেই শ্রোতাদের কান তৈরির জন্য তখন গানের অনেক শ্রেণিবিভাগ করা হয়েছিল। যেমন আধুনিক, কাব্যসংগীত, নাট্যসংগীত, ভাবসংগীত, প্রেমসংগীত ও রাগপ্রধান। রাগপ্রধানের ওপর পরবর্তী কালে বেশি জোর দেওয়া হয়েছে। 'রাগপ্রধান' নামটিও উদ্ভাবন করেছেন সুরেশ চক্রবর্তী।

১৯৩৫/১৯৩৬ সালে কলকাতা বেতারে সংগীতের ক্ষেত্রে বৈচিত্র্যের জোয়ার আসে। শ্রোতার সংখ্যা যতই কম থাকুক, এমনকি সকলের ঘরে রেডিয়ো না থাকলেও ভারতীয় সংগীতের একটা স্বরূপ শ্রোতাদের কাছে তুলে ধরা গিয়েছিল।

আরেকটি বড়ো কাজ রেডিয়ো সেই সময়ে করেছিল, তা হলো নিজস্ব একটা অর্কেস্ট্রা গ্রুপ তৈরি করা। নাম ছিল 'যন্ত্রীসংঘ'। তার পরিচালক সুরেন্দ্রলাল দাস। এটা একটা বড়ো ঘটনা এই কারণে যে, সেই সময়ে যাবতীয় যন্ত্রসংগীতে ইউরোপীয় যন্ত্রসংগীতেরই প্রয়োগ হতো বেশি। কিন্তু কলকাতা বেতারের কলাশিল্পীরা অনুভব করলেন ভারতীয় যন্ত্রের একটা অর্কেস্ট্রা দরকার। কিন্তু সব ভারতীয় যন্ত্র জোগাড় করাও সহজ ছিল না। তবু অনেক চেষ্টা করে সেই তঅভাব পূরণের জন্য রেডিয়োর সংগীত পরিচালক (আসলে তিনি সুরেশ চক্রবর্তীই) মন্দ্রবাহার, মেঘনাদ, কোয়েলা, ভ্রামরী, তারসানাই, রঙসানাই ইত্যাদি যন্ত্রের উদ্ভাবন বা নামকরণ করে তাদের সাহায্যে নতুন অর্কেস্ট্রা গঠন করলেন। তার নাম আগে রাখা হয়েছিল 'ক্যালকাটা অর্কেস্ট্রা', পরে পরিবর্তন করে রাখা হয় 'যন্ত্রীসংঘ'।দ ;একথা আমাদের জানিয়েছেন সুরেশ চক্রবর্তীই। তিনি এমন কথাও বলছেন, কলকাতা বেতারকেন্দ্রে গঠিত অর্কেস্ট্রা, অথবা তার বাইরের কিছু অর্কেস্ট্রার কাছে তখনকার 'সিনেমার সংগীত অনেক পরিমাণেই ঋণী'। তার চেয়েও বড়ো কথা সেই ত্রিশের দশকেই কলকাতা বেতারে গান-লিখিয়ে এবং সুরসংযোজক আর সেই সঙ্গে গানের শিল্পীসমন্বয়ে যে 'অভিনব সুরের নকশা জনসাধারণে প্রচারিত হয়েছিল', আধুনিক বাংলা গানে তাঁর অবশ্যই প্রভাব পড়েছিল। আবার অন্যদিকে পল্লীগীতিকে বিশেষভাবে বুঝে-শুনে পরিবেশন করার উদ্দেশ্যে চট্টগ্রাম থেকে মানভূম পর্যন্ত বিস্তীর্ণ প্রদেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে বহুসংখ্যক আদর্শ গীত সংগ্রহ করা হয়েছিল। লোকসংগীত সংগ্রহ হিসেবেও এর মূল্য কম ছিল না। এদিকে কলকাতা বেতার চালু হওয়ার দু-এক বছরের মধ্যে এর সঙ্গে যুক্ত হয়ে গেলেন কাজী নজরুল। তাঁকে নিয়ে আসার ব্যাপারে নলিনীকান্ত সরকারের বিশেষ ভূমিকা ছিল। বেতারের জন্য গান লিখেছেন, বিভিন্ন শিল্পীর গলায় তুলে দিয়েছেন সেই গান। শচীন সেনগুপ্ত, মন্মথ রায়, এমন অনেকেরই নাটকের জন্য গান লিখেছেন, সুর দিয়েছেন। হারিয়ে যাওয়া রাগের কাঠামোয় গান লিখেছেন।

সেই নজরুল বেতারের এমন সংগীত-ব্যক্তিত্ব হয়ে উঠলেন যে দিল্লি থেকে তাঁকে বেতারের সংগীত বিভাগের উপদেষ্টা হবার সরকারি অনুরোধ এসেছিল। 'ধূমকেতু'র নজরুল ব্রিটিশের চোখে কিন্তু তার আগে রাষ্ট্রদ্রোহী। তাঁর বই নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়েছে। জেলে অনশনে বসেছেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁকে অনশন প্রত্যাহারের অনুরোধ জানাচ্ছেন। এমন মানুষ সেই যুগে ব্রিটিশ ভারতে তখন বেতার-শ্রোতাদের কাছে বরণীয় শিল্পী। স্বাধীনতা আন্দোলনে বা

কংগ্রেসের সঙ্গে, সশস্ত্র বিপ্লবের নেতাদের সঙ্গে কাজ করেছেন। তখন এমন আরও অনেকে ছিলেন বেতারে। তার মধ্যে একজন সংগীতজ্ঞ সুরেশ চক্রবর্তী। ময়মনসিংহে তাঁর জন্ম। আইন পড়েছেন। স্বাধীনতা আন্দোলনে জড়িয়ে কিছুদিন কারারুদ্ধও ছিলেন। তিনিই হয়ে উঠলেন স্বশিক্ষিত সংগীতজ্ঞ। এসে পড়লেন বেতারে। তার পরের গল্প অনেক বড়ো।

বেতারে যিনি ছোটোদের আসর প্রথম পরিচালনা করেন, সেই যোগেশচন্দ্র বসু ছিলেন দাদাভাই নওরোজির সচিব। পেস্টবোর্ডের কারখানা খুলে উন্নত বোর্ড আর ব্লটিং পেপার উৎপাদনের জন্য আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের হাত থেকে পুরস্কার নিয়েছিলেন। পেশায় ছিলেন আইনজীবী। বেতারে তাঁকে নিয়ে এসেছিলেন নৃপেন্দ্রনাথ মজুমদার। তিনিই প্রথম বেতারে শিশুদের অনুষ্ঠানের একটা ঘরানা তৈরি করেছিলেন। এক পয়সাও মাইনে নিতেন না। বরং শিশুদের মজাদার গল্প, রূপকথা শোনানোর জন্য ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরিতে ছুটে যেতেন। আর বই কিনতেন। ছোটোদের আসরে তাঁর নাম ছিল 'গল্পদাদা'। সেই 'গল্পদাদা' থেকেই পরবর্তী কালে কিশোর-কিশোরীদের আসরের নাম হয় 'গল্পদাদুর আসর'। মাঝে কখনো 'ছোটোদের বৈঠক' বা কখনো 'ছোটোদের আসর';নামটা অনেকদিনই চলে। যোগেশ বসুর পুত্র কমল বসু এবং নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়ও এই আসর পরিচালনা করেছেন।

শরৎচন্দ্র প্রয়াত হন ১৯৩৮ সালের ১৬ জানুয়ারি। তাঁকে নিয়ে প্রকাশিত হয়েছিল 'বেতার জগৎ'-এর বিশেষ সংখ্যা। বিশেষ সংখ্যা মানে পাতার সংখ্যা যে বেশি তা নয়, কিন্তু ফেব্রুয়ারির প্রথম পক্ষে যে-সংখ্যাটি প্রকাশিত হয়েছে, সেখানে সবগুলি লেখাই শরৎচন্দ্রকে নিয়ে। তাঁর প্রয়াণের আগের বছর তো বটেই, তারও আগে কয়েকটি বছর বেতারে শরৎচন্দ্রের জন্মদিবস তাঁর উপস্থিতিতেই পালিত হয়েছে। প্রতি বছরই গুণীজনের সমাবেশ হয়। বড়োমাপের গাইয়ে-বাজিয়েরাও হাজির থাকতেন। তার মধ্যে মৃত্যুর আগের বছরের জন্মদিনটাই যেন ঘটা করে পালিত হয়েছিল। সেই ৬২তম জন্মদিবসে শরৎচন্দ্র অনেক কথাই উপস্থিত গুণীজন এবং শ্রোতাদের উদ্দেশে বলেছিলেন। তার মধ্যে কয়েকটি কথা সেদিন নিশ্চয়ই শ্রোতাদের হৃদয় স্পর্শ করেছিল। তিনি বলেছিলেন ঃ'আপনারা শুনেছিলেন যে কিছুদিন পূর্বে আমি কঠিন রোগাক্রান্ত হয়ে পড়েছিলাম। সে-অবস্থা এখন আর আমার নেই, তাহলেও স্বাস্থ্য একেবারে চিরদিনের মতো ভেঙে গেল এবং আশা করতে পারি না যে বছরে বছরে এইসব বেতার প্রতিষ্ঠানের বন্ধুদের আমন্ত্রণে আসতে পারবো। আমার নিজের সাহিত্য-সাধনার ব্যাপারে মুখে কিছু বলা যায় না। শুধু এটুকুই ইঙ্গিতে বলতে পারি যে অনেক দুঃখের মধ্যে দিয়ে এই সাধনায় ধীরে ধীরে অগ্রসর হয়েছি। কোনোদিনই আমি মনে করিনি যে আমি সাহিত্যিক হবো বা কোনো বই আমার কোনোদিনই প্রকাশিত হবে। এমনকি যা লিখেছি, তাও সংকোচে, দ্বিধায়, পরের নামে। তার কোনো মূল্য আছে কিনা ভাবতে পারিনি। তারপর দীর্ঘকাল বোধহয় এমন ১৫/১৬ বৎসর, সাহিত্যচর্চার ধার দিয়েও যাইনি। ভুলেও মনে হতো না যে আমি কোনোদিন লিখি। তারপরে আবার নানা অবস্থার মধ্যে দিয়ে আবার এই জীবন; এটিই হয়তো আমার সত্যকার জীবন। অন্তত ভগবান বোধহয় এই জীবনটা আমার জন্য নির্দিষ্ট করে রেখেছিলেন। তাই ইচ্ছা না থাকা সত্ত্বেও ঘুরে ফিরে আবার এরি মধ্যে এই একষট্টিটা বছর আমাকে কাটাতে হলো।'

শরৎচন্দ্রের এই অভিভাষণটি সেদিন রেকর্ড করা হয়েছিল। আফশোস হয়, আজ যদি সেই রেকর্ডিং শোনার সুযোগ থাকত! অন্যান্য বছরে কীভাবে উদ্‌যাপিত হয়েছে, থাকত যদি তার রেকর্ডিও;তবে পরবর্তী কালের শ্রোতাদের কাছে তা হতো পরম পাওয়া। আজ ভাবলে একটু অন্যরকমই লাগে যে-শরৎচন্দ্রের 'পথের দাবী' উপন্যাস ব্রিটিশ সরকার নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে, পরবর্তী কালে তাঁরই জন্মদিন উদ্‌যাপিত হচ্ছে সরকার-নিয়ন্ত্রিত বেতারেই।

অন্যদিকে নানা বিষয়ে নজরুলের কথিকা, এমনকি রবীন্দ্রপ্রয়াণে সেইদিনই সন্ধ্যায় তিনি যে শোকার্ত কণ্ঠে 'রবিহারা' কবিতা পড়েছিলেন, তারও রেকর্ডিংয়ের কথা, বা তা সংরক্ষণের কথা আমাদের জানা নেই। তবে রবীন্দ্রনাথের যত গান কবিতা রেকর্ড করা হয়েছিল, তা সবই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় বোমা হামলার ভয়ে বাক্সবন্দি করে দিল্লি কেন্দ্রে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল (১৯৪২)। ওই সময়ে কলকাতার হাতিবাগান সহ কয়েকটি জায়গায় বোমা পড়ে। তার মধ্যে ডালহৌসি স্কোয়ারও ছিল। আর ডালহৌসি স্কোয়ারের গা ঘেঁষেই এক নম্বর গারস্টিন প্লেসের স্টুডিয়ো।

কলকাতায় বেতারের যাত্রা শুরুর প্রথম দশ-বারো বছর নিয়েই বেশি কথা বলছি, কারণ এই সময়টা একদিকে যেমন বেতারের শ্রোতাদের কাছে জনপ্রিয় করা, তেমনি অনুষ্ঠানের মান উন্নত করার জন্য বেতারের সমস্ত কর্মী ও কর্তাব্যক্তিদের কঠিন লড়াইয়ের প্রতিজ্ঞা নিয়ে চলতে হয়েছে। সরকারি নির্দেশে নয়, রেডিয়োর মতো মাধ্যমকে ভালোবেসে, দেশ ও তার সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যকে ভালোবেসে। অনুষ্ঠানের গুণাগুণ নিয়ে ব্রিটিশ সরকারের কোনো

মাথাব্যথা ছিল না। তবে মাথাব্যথা ছিল 'রাজভক্তি' নিয়ে। ১৯৩৬-এর 'বেতার জগৎ'-এ সম্রাট পঞ্চম জর্জের প্রয়াণে যে বিশেষ সংখ্যাটি প্রকাশিত হয়েছিল, সেখানে সুরেশ চক্রবর্তী, বিজন বসু, নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় সহ বেতারের অনেকেই সম্রাটের সুকীর্তি নিয়ে লিখেছেন। তারপর ইংল্যান্ডের রাজসিংহাসনে বসেছিলেন অষ্টম এডোয়ার্ড। তাঁকে নিয়েও বেরিয়েছিল 'বেতার জগৎ'-এর বিশেষ সংখ্যা। কিন্তু সেটা তাঁর জন্মদিন উপলক্ষে। সিংহাসনে বসলেও তাঁর আনুষ্ঠানিক রাজ্যাভিষেক হয়নি। তিনি বিবাহ করেছিলেন এক বিবাহবিচ্ছিনা মহিলাকে। তাই রাজসিংহাসনে বসেছিলেন তাঁর ভাই ষষ্ঠ জর্জ। পঞ্চম জর্জকে নিয়ে 'বেতার জগৎ'-এর সংখ্যাটি এতই ভালো হয়েছিল, যে তখনকার কন্ট্রোলার অফ ব্রডকাটিং লায়োনেল ফিলডেন দিল্লির সব কর্মীকে সেই পত্রিকা দেখিয়ে কলকাতা কেন্দ্রের কাজের প্রশংসা করেন। এই কাজে খুশি হয়ে ফিলডেন, 'বেতার জগৎ'-এর তখনকার সম্পাদক নলিনীকান্ত সরকারের মাইনে পঞ্চাশটাকা থেকে বাড়িয়ে তিনশো টাকা করে দেন। তাঁর সম্পাদনাতেই ১৯৩৭ সালে প্রথম 'বেতার জগৎ'-এর শারদীয় সংখ্যা প্রকাশিত হয়।

লায়োনেল ফিলডেনের প্রসঙ্গ যখন এসেই পড়ল, তখন বলতেই হয়, ভারতীয় বেতারের প্রসারে তাঁর বিশেষ ভূমিকার কথা। এদেশে বেতার-ব্যবস্থার উন্নতি সাধনে, অথবা বলা যেতে পারে, সম্প্রচারের ক্ষেত্রে আধুনিক পেশাদারিত্বের হাওয়া নিয়ে আসতে তাঁকে বিবিসি থেকে পাঠানো হয়েছিল এদেশে। ১৯৩৫ সালে। ছিলেন পাঁচ বছর। তাঁর সময়েই দেশে বেতারকেন্দ্রের সংখ্যা তিন-চার গুণ বেড়ে যায়। ভারতীয় বেতারের 'অল ইন্ডিয়া রেডিয়ো' নামকরণ তাঁরই ভাবনাপ্রসূত। তাঁর সময়েই রবীন্দ্রনাথের প্রস্তাব মেনে বেতার হারমোনিয়ামের ব্যবহার বন্ধ হয় (১৯৪০)। তিন দশক বেতারে হারমোনিয়াম বন্ধ ছিল। তাঁর সময়েই রবীন্দ্রকণ্ঠে আবৃত্তির সরাসরি সম্প্রচার, কবিতা ও গান রেকর্ডিংয়ের মতো ঘটনা ঘটেছে। দেশ পরাধীন হলেও, বেতার কঠোরভাবে সরকার-নিয়ন্ত্রিত হলেও তিনি বিশ্বাস করতেন বেতার জনপরিষেবার মধ্যে পড়ে। সেই সঙ্গে দেশের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের চর্চায় বেতারের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে বলে তিনি মনে-প্রাণে বিশ্বাস করতেন। অন্যদিকে নাটক বেতার-শ্রোতাদের কাছে ছিল খুবই পছন্দের অনুষ্ঠান। আদিযুগে শ্রোতাদের চাহিদা মেটাতে অনেক সময়ে মঞ্চ থেকে নাটক সরাসরি রিলে করা হতো। এতে শ্রোতারা বিখ্যাত অভিনেতা-অভিনেত্রীদের কণ্ঠস্বর শুনতে পেতেন বটে; কিন্তু নাট্যকাহিনি ঠিক ধরতে পারতেন না। তাছাড়া দর্শকদের হাততালি, 'এনকোর', 'এনকোর' ধ্বনির মধ্যে নাটকের সংলাপের অনেকসময়ে বোঝাই যেত না। এমনকি অভিনেতাদের সংলাপহীন কায়িক অভিনয়ের ব্যাপারটা রেডিয়োর শ্রোতারা কিছুই বুঝতেন না। এতটা অস্বস্তি আর অপূর্ণতার মধ্যেও প্রখ্যাত অভিনেতাদের কণ্ঠস্বর শোনার কিছুটা আনন্দ অবশ্য শ্রোতারা পেতেন।

লায়োলেন ফিলডেন এমন অপেশাদার নাট্যানুষ্ঠান পরিবেশন একেবারেই পছন্দ করতেন না। কারণ তিনি বিশ্বাস করতেন রেডিয়োর মতো নাটকের উপস্থাপনরীতিই হবে সম্পূর্ণ আলাদা। কারণ বেতার-নাটকে সবই শ্রোতার কাছে কল্পনায় দৃশ্যমান, আর উপস্থাপিত হবে অন্ধের দৃষ্টির গরিমা নিয়ে। ফিলডেনের আগ্রহেই তখন বেতারোপযোগী নাটক লেখার ঝোঁক বাড়ল। ফলে ফিলডেন শুধু বেতারের সামগ্রিক উন্নতি নয়, তার সংস্কার কাজেও যথেষ্ট উৎসাহী ছিলেন।

শুরুতেই তিন-চার বছরের মধ্যে রেডিয়োকে অনেক ঝড় সামলাতে হয়েছে। অর্থসংকটে রেডিয়ো উঠে যাবারই দশা হয়েছিল ১৯৩০ সালে। শেষে অনেক টানাপোড়েনের পর সরকারকেই নিতে হলো বেতার চালনার ভার। নাম হলো 'ইন্ডিয়ান স্টেট ব্রডকাস্টিং সার্ভিস'। আগে ছিল ইন্ডিয়ান ব্রডকাস্টিং কোম্পানির হাতে। এতেও শুরুর দিকটা (১৯৩১-৩২) সরকারকে অনেকরকম ধাক্কা সামলাতে হয়েছে। তবুও শুরুর দশ-বারোটা বছর কলকাতা বেতার এত গুণী মানুষ ও শিল্পীদের সমাবেশ ঘটিয়েছিল, যা ভাবতে রোমাঞ্চ লাগে।

তালিকা দীর্ঘ করলে একঘেয়ে লাগবে। ওই সময়ে বেতারে আসছেন অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, দীনবন্ধু এন্ড্রুজ, রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ক্ষিতিমোহন সেনশাস্ত্রী, সুনীতি চট্টোপাধ্যায়, কালিদাস নাগ, অশোক নাথ শাস্ত্রীরা। 'জাতীয় জীবনে বৈজ্ঞানিকের স্থান' বিষয়ে বলতে আসছেন মেঘনাদ সাহা, আসছেন সি. ভি. রমন। এরও পরে ১৯৪০-এ আসছেন আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র, লেডি অবলা বসু, 'ভারতীয় চলচ্চিত্রে গলদ কোথায়';সেই বিষয়ে বলতে আসছেন প্রমথেশ বড়ুয়া, রকমারি রসালো কথার ভাণ্ডার নিয়ে আসছেন দাদাঠাকুর। আবার গাইয়ে-বাজিয়ে শিল্পীদের মধ্যে হরিমতি, কঙ্কাবতী, ইন্দুবালা, আঙুরবালা, সুশীলা সেন মনিপুর, রাধারাণী, বিজনবালা ঘোষদস্তিদার, আব্বাসউদ্দিন, বীরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী, কমলাবালা (ঝরিয়া), দীপালি তালুকদার (পরে নাগ), রাধিকামোহন মৈত্র, সুখেন্দু গোস্বামী, দিলীপকুমার রায়, উমা বসু, সত্য চৌধুরী, জমিরুদ্দিন খাঁ, আলি আহমেদ খাঁ, ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ, গোকুল নাগ এমন অনেকেই। আর 'ছোটোদের বৈঠক', 'বিদ্যার্থীমণ্ডল',

'পল্লীমঙ্গল আসর', 'মহিলা মজলিশ';এসব তো ছিলই। আর ছিল নতুন নতুন শিল্পীদের নিয়ে 'নবাগতের আসর'। নবাগত মানেই যেমন তেমন শিল্পী নন। এর দায়িত্বে ছিলেন সুরেশ চক্রবর্তী। নবাগতদের তিনি রীতিমতো পরখ করে নিতেন। তাঁদের উপস্থাপনা প্রতিষ্ঠিতদের পাশে মোটেই বেমানান ছিল না। তবে নবাগতদের আসরে কখনো কখনো শিল্পী কম পড়ত। কারণ শিল্পী নির্বাচনের সময়, মানে অডিশনের সময় সুরেশ চক্রবর্তী বেশ কড়াধাতের মানুষ ছিলেন। গুণীর কদর করতেন, আপোশ করতেন না কখনো। তাই আসরের শিল্পীসংখ্যা যে বেশি ছিল, এমন নয়। কিন্তু উদীয়মান শিল্পীদের বেতারের সঙ্গে যুক্ত করার কাজটা চলছিলই।

শুরুর সময় বেশ কয়েকবছর অনেক অভিজাত ঘরের উদীয়মান গাইয়ে-বাজিয়েরা রেডিয়ো থেকে মুখ ফিরিয়ে থাকতে চাইতেন। মুখে বেশি না বললেও অনেকেরই চাপা অভিযোগ ছিল, মহিলা শিল্পীদের 'নিষিদ্ধ পল্লী' থেকে নিয়ে আসা হয়েছে, তাই অনেকেই রেডিয়োতে গাওয়ার ব্যাপারে কুণ্ঠিত ছিলেন। অভিভাবকরাও চাইতেন না বাড়ির ছেলেমেয়েরা বেতারে অনুষ্ঠান করুক। বেতারেরই কেউ যদি চলতি পথে কখনো কারও বাড়িতে রেয়াজের সময় গান-বাজনা শুনে আকৃষ্ট হতেন, তারপর কড়া নেড়ে যদি আমন্ত্রণ জানাতেন রেডিয়োতে, তাদের মুখের ওপর অনেক বাড়ির কর্তা দরজা বন্ধ করে দিতেন। এমন কিছু ঘটলেও কলকাতা বেতারের চালকরা তখন শিল্পীর গুণকেই কদর করতেন, বিচার করতেন না তিনি কোন 'পল্লী' থেকে এসেছেন। এটাও ছিল তখনকার দিনে কলকাতা বেতারের একটা চ্যালেঞ্জ। তার ওপরে ভিত্তি করেই বেতার এতটা পথ পেরিয়ে এসেছে। দিন দিনে শ্রোতাদেরও ভুল ধারণা ভেঙেছে। উন্নতমানের অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে যেমন একদিকে এই চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করা, 'বেতার জগৎ' পত্রিকায় বিশ্বে বেতারের অগ্রগতি নিয়ে নীরদ সি চৌধুরী, মনোমোহন ঘোষের লেখা শ্রোতাদের চিন্তাকে এই মাধ্যমটি ঘিরে এক নতুন দিগন্তে পৌঁছে দিয়েছে।

কিন্তু এসব ঘটনা ঘটেছে কোথায়? এক নম্বর গারস্টিন প্লেসের স্টুডিয়োতে, যেখানে কলকাতা বেতার কাটিয়ে দিয়েছে প্রথম তিন দশক (১৯২৭-১৯৫৮)। কিন্তু সেই ঐতিহ্যসম্পন্ন বাড়িটি আজ আর নেই। তাকে গুঁড়িয়ে দিয়ে উঠেছে বাণিজ্যিক ভবন।তাও হয়ে গেল আজ তিনদশক।

(লেখক বেতার ও দূরদর্শনের প্রাক্তন বার্তা সম্পাদক।)

ইতিহাস

বিপ্লবী ভগৎ সিং - এর দৃষ্টিতে দুই নেতা জওহরলাল নেহরু ও সুভাষ চন্দ্র বসু



অভিনব চক্রবর্তী

' বিপ্লবী ভগৎ সিং কেন সুভাষচন্দ্র বসুর চেয়ে জওহরলাল নেহেরুকে বেছে নিয়েছিলেন'— শীর্ষক নিবন্ধটি গত ১৪ নভেম্বর পণ্ডিত নেহরুর জন্মদিবসে Indian Express দৈনিক এর : On line edition এ প্রকাশিত হয়। স্বাধীনতা সংগ্রামে কার গ্রহণযোগ্যতা বেশি;নেহেরু নাকি বসু? এই নিয়ে রাজনৈতিক মহলে দীর্ঘকাল ধরে বিতর্ক ও আলোচনা চলে আসছে। এই প্রেক্ষাপটে ১৯২৮ সালে লেখা ভগৎ সিংয়ের একটি প্রবন্ধ অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ও আলোকপাতকারী।

লেখক: অভিনব চক্রবর্তী নতুন দিল্লি ঊ ১৪ নভেম্বর, ২০২৬, সকাল ৬:৩০।

কংগ্রেসের পতাকাতলে আবির্ভূত দুই তরুণ স্বাধীনতা সংগ্রামীর উত্তরাধিকার নিয়ে গত প্রায় এক শতাব্দী ধরে এই রাজনৈতিক বিতর্ক চলছে যে, স্বাধীনতা আন্দোলনে জওহরলাল নেহেরু ও সুভাষচন্দ্র বসুর মধ্যে কার গ্রহণযোগ্যতা বেশি ?

১৯৩০-এর দশকের শেষের দিকে সুভাষচন্দ্র বসু কংগ্রেস ত্যাগ করে সিঙ্গাপুরে ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল আর্মি (INA)-র দায়িত্ব গ্রহণ করার পর থেকেই তাঁকে অনেকেই একজন 'বিপ্লবী' এবং 'কর্মঠ মানুষ' হিসেবে দেখতে অভ্যস্ত;বিপরীতে নেহেরু কংগ্রেসের মধ্যেই থেকে যান, তাঁকে 'কথার মানুষ' হিসেবে দেখা হয় এবং পরবর্তীতে তিনি স্বাধীন ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী হন।

আজ (১৪ নভেম্বর) যখন ভারত নেহেরুর জন্মবার্ষিকী পালন করছে, তখন অপর এক 'বিপ্লবী' ও 'কর্মঠ মানুষ' হিসেবে খ্যাত ভগৎ সিং সুভাষ ও নেহেরুর রাজনৈতিক মতাদর্শ সম্পর্কে কী ভেবেছিলেন, তা পড়া অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। ১৯২৮ সালের জুলাই মাসে 'কীর্তি' পত্রিকার পাতায় 'নতুন নেতা ও তাঁদের ভিন্ন ভিন্ন মতাদর্শ' (Naye Netaaon ke Alag Alag Vichar) শিরোনামে প্রকাশিত

একটি প্রবন্ধে তিনি এই বিষয়ে লিখেছিলেন।

আধুনিক মানসিকতাসম্পন্ন তরুণ নেতৃত্ব

প্রবন্ধের শুরুতেই ভগৎ সিং লিখেছেন যে, ১৯২০-২২ সালের অসহযোগ আন্দোলনের ব্যর্থতা এবং পরবর্তী দশকে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে চলা সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষের পর ভারতীয়দের সমস্ত আশা ও সংকল্প ভেঙে পড়েছিল। কিন্তু আধুনিক মানসিকতাসম্পন্ন বহু নতুন নেতার আবির্ভাব এবং যুব আন্দোলনের জোয়ারের ফলে পুরনো প্রবীণ নেতাদের পিছনে ফেলে কেবল 'তরুণ নেতারাই' দেশপ্রেমিক ভারতবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছিলেন।

তিনি এমন দু'জন নেতার কথা তুলে ধরেছেন যাঁরা বাকিদের চেয়ে মাথা তুলে উঠেছিলেন: 'বাংলার শ্রদ্ধেয় সুভাষচন্দ্র বসু' এবং 'বিশিষ্ট পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু'।

ভগৎ সিং লিখেছেন, 'তাঁরা দুজনেই ভারতীয় স্বাধীনতার আপসহীন প্রবক্তা; দুজনেই বুদ্ধিমান এবং প্রকৃত দেশপ্রেমিক। অথচ, তাঁদের মতাদর্শ রাতের মতো এবং দিনের মতো সম্পূর্ণ আলাদা। একজন ভারতীয় প্রাচীন সংস্কৃতির ভক্ত ও প্রচারক বলে মনে করা হয়, এবং অন্যজনকে পাশ্চাত্য সভ্যতার এক নিষ্ঠ অনুসারী হিসেবে দেখা হয়। যদি একজনকে নরমপন্থী ও সংবেদনশীল হিসেবে ভাবা হয়, তবে অন্যজনকে বলা হয় সর্বাঙ্গীন বিপ্লবী।'

তিনি আরও যোগ করেন, তাঁর উদ্দেশ্য ছিল উভয়ের নিজ নিজ মতাদর্শ তুলে ধরা, যাতে সাধারণ মানুষ দু'জনের পার্থক্য বুঝতে পারে এবং নিজেদের সিদ্ধান্ত নিতে পারে।

নেহেরু ও বসু সম্পর্কে ভগৎ সিং কী বলেছিলেন ?

এই প্রবন্ধের খাতিরে তিনি দুই নেতার সাম্প্রতিক অতীতে দেওয়া বক্তৃতাগুলোকে ভিত্তি করেছেন। তিনি উল্লেখ করেছেন যে, দুজনেই কংগ্রেসের 'উগ্রপন্থী' বা চরমপন্থী অংশের অন্তর্ভুক্ত বলে বিবেচিত হতেন এবং 'পূর্ণ স্বরাজ'-এর পক্ষে জোরালো সওয়াল করেছিলেন, তবুও 'চিন্তাভাবনার দিক থেকে দুই নেতা একে অপরের সম্পূর্ণ বিপরীত মেরুর।'

ভগৎ সিংয়ের মতে, বোম্বাইয়ের (বর্তমান মুম্বই) একটি সম্মেলনে দুই নেতার বক্তৃতা শোনার পরই তাঁদের মধ্যকার পার্থক্য 'দিনের আলোর মতো পরিষ্কার' হয়ে গিয়েছিল। বসুকে তঅত্যন্ত আবেগপ্রবণ বাঙালিদ বলে অভিহিত করে তিনি উল্লেখ করেন, বসু বলেছিলেন যে বিশ্বের জন্য ভারতের একটি বিশেষ বার্তা রয়েছে এবং মানবতার জন্য রয়েছে এক আধ্যাত্মিক শিক্ষা। ভারতীয়দের বেদে ফিরে যাওয়ার সুভাষের এই দাবির কথা উল্লেখ করে ভগৎ সিং একে 'সেই পুরনো রোমান্টিসিজম' এবং 'নিছক আবেগতাড়িত মানসিকতা' বলে অভিহিত করেছেন।

ভগৎ সিং লিখেছেন, 'বসু মহাশয়ের প্রাচীন অতীতের ওপর অগাধ বিশ্বাস রয়েছে। তিনি এই প্রাচীন যুগে কেবল মহিমান্বিত দিকটিই দেখতে পান। তাঁর মতে, পঞ্চায়েত রাজ বা জনকল্যাণমূলক ব্যবস্থায় নতুন কিছু নেই, যা ভারতে অতি প্রাচীনকাল থেকেই ছিল। তিনি এমনকী এ কথাও বলতে পিছপা হননি যে সাম্যবাদও ভারতের কাছে নতুন কিছু নয়।

এর সম্পূর্ণ বিপরীত দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরে নেহেরুর কথা উল্লেখ করে ভগৎ সিং দেখিয়েছেন, নেহেরু তাঁর বক্তৃতায় বলেছিলেন: 'প্রতিটি দেশই মনে করে যে বিশ্বের জন্য তাদের বিশেষ কোনো বার্তা রয়েছে... কিন্তু আমার দেশের একার বিশেষ কিছু আছে বলে আমার চোখে পড়ে না।'

নেহেরু আরও বলেন যে প্রতিটি তরুণকে কেবল রাজনৈতিক ক্ষেত্রেই নয়, বরং সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং ধর্মীয় ক্ষেত্রেও বিদ্রোহ করতে হবে। নেহেরুর উদ্ধৃতি দিয়ে তিনি লেখেন, 'কেউ যদি আমার কাছে এসে বলে যে কোরআনে অমুক কথা বলা আছে, তবে সেই মানুষটিকে আমি খুব একটা গুরুত্ব দিই না। সমস্ত অযৌক্তিক বিষয়কে বর্জন করতে হবে, বেদ বা কোরআনে তার পক্ষে যতই যুক্তি থাকুক না কেন।'

'শুধু হৃদয় নয়, মনকেও জাগানো'

ভগৎ সিংয়ের মতে, নেহেরুর চিন্তাভাবনা ছিল একজন 'প্রকৃত বিপ্লবীর', যেখানে বসুর ভাবনা ছিল এমন একজন মানুষের মতো যিনি কেবল এক শাসনব্যবস্থার পরিবর্তে অন্য এক শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে চান। ভগৎ সিং লিখেছেন, 'একজন মানুষ মনে করেন আমাদের পুরোনো ব্যবস্থাগুলো অত্যন্ত শ্রেষ্ঠ; অন্যজন বিশ্বাস করেন যে আমাদের এই ব্যবস্থাগুলোর বিরুদ্ধেই বিদ্রোহ করা উচিত। অথচ শেষোক্ত মানুষটিকেই বলা হয় আবেগপ্রবণ, সংবেদনশীল, আর প্রথমোক্তজনকে বলা হয় এক পরিবর্তনকামী বিপ্লবী!'

ভগৎ সিং পার্থক্যের আরেকটি দিক তুলে ধরেছেনঞ্কেন বসু এবং নেহেরু উভয়েই পূর্ণ স্বরাজের দাবি তুলেছিলেন। ভগৎ সিংয়ের মতে, বসু এর পক্ষে ছিলেন কারণ 'ব্রিটিশরা পশ্চিমা এবং আমরা প্রাচ্যের মানুষ', আর নেহেরুর অবস্থান ছিল যে 'আমাদের নিজস্ব শাসন প্রতিষ্ঠা করতে হবে যাতে আমরা সম্পূর্ণ সামাজিক কাঠামোটিই

বদলে দিতে পারি।' এছাড়া, বসু শ্রমিক শ্রেণীর প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন এবং তাদের অবস্থার উন্নতি করতে চেয়েছিলেন, আর নেহেরু চেয়েছিলেন 'একটি বিপ্লব ঘটিয়ে সামগ্রিকভাবে বর্তমান ব্যবস্থাটিকে সম্পূর্ণ বদলে দিতে।'

ভগৎ সিং লিখেছেন, 'সুভাষচন্দ্র আবেগপ্রবণ এবং রোমান্টিক; তিনি যুবসমাজকে তাদের হৃদয়ের খোরাক জোগাচ্ছেন, কেবল হৃদয়ের। আর অন্য মানুষটি হলেন এক যুগান্তকারী পরিবর্তন-নির্মাতা যিনি কেবল হৃদয়কে নয়, বরং মনকেও প্রজ্বলিত করছেন।'

এরপর ভগৎ সিং পাঠকদের, বিশেষ করে পাঞ্জাবের যুবসমাজকে উদ্দেশ করে বলেন যে, কীভাবে একটি পাঞ্জাবি সংবাদপত্র বসুর ভূয়সী প্রশংসা করেছিল এবং নেহেরুর মতো বিদ্রোহীদের সম্পর্কে বলেছিল যে তারা তপাথরে মাথা কুটে নিজেদের ধ্বংস করছেদ। তিনি পাঠকদের অন্ধ অনুসারী না হওয়ার পরামর্শ দিয়ে মনে করিয়ে দেন: 'পাঞ্জাব সবসময়ই একটু আবেগপ্রবণ প্রদেশ। এখানকার মানুষের আবেগ খুব দ্রুত জেগে ওঠে এবং ফেনকণার মতো ঠিক তত দ্রুতই মিলিয়ে যায়।'

অন্ধ ভক্ত না হওয়ার বিষয়ে সতর্ক করার পর, ভগৎ সিং পাঞ্জাবের তরুণদের প্রতি আহ্বান জানিয়ে তাঁর প্রবন্ধ শেষ করেছেন;বিপ্লবের আসল অর্থ এবং ভারত ও দেশের বাইরে এর তাৎপর্য উপলব্ধি করতে নেহেরুর পথেই যেন তারা চালিত হয়।

ভগৎ সিং লিখেছেন, 'সুভাষচন্দ্রকে দেখে মনে হয় না যে তিনি কোনো বুদ্ধিবৃত্তিক খোরাক জোগাচ্ছেন, তিনি কেবল হৃদয়ের খোরাক দিচ্ছেন। বর্তমানে পাঞ্জাবের যুবসমাজের প্রধান প্রয়োজন হলো বিপ্লবী মতাদর্শকে বোঝা এবং তা শক্তিশালী করা। এই সময়ে পাঞ্জাবের মনের খোরাক প্রয়োজন, আর তা কেবল পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরুর কাছ থেকেই পাওয়া সম্ভব।'

ইতিহাসের প্রেক্ষিতে বইয়ের ওপর আক্রমণ

শঙ্কর ঘোষ

সেদিন ছিল ১৯৩৩ সালের ১০ মে। হিটলার জার্মানিতে সবে সাড়ে চার মাস ক্ষমতায় বসেছেন।বার্লিনে দেখা গেল একটা অদ্ভুত দৃশ্য।মধ্যরাতে একদল ছাত্র হাতে মশাল নিয়ে প্রবেশ করল বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ের ঠিক উল্টো দিকে একটা পার্কে।সেখানে আগে থেকেই জড় করে রাখা হয়েছে প্রায় কুড়ি হাজার বই। 'ফুরার জিন্দাবাদ' ধ্বনি দিতে দিতে উল্লাসের সাথে ছাত্ররা সেই বইয়ের স্তুপে আগুন ধরিয়ে দিল। পুড়ে ভস্মীভূত হয়ে গেল মানব সভ্যতার অমুল্য রত্নরাজি।ইউরোপে মধ্যযুগের পরে এমন দৃশ্য আর দেখা যায়নি।

কাদের রচনা ছিল সেই সব গ্রন্থ? টমাস ও হাইনরিখ মান,এরিখ মারিয়া রেমার্ক,আলবার্ট আইনস্টাইন ও জার্মানির সব প্রথিতযশা মনীষীদের রচিত গ্রন্থ।

ইউরোপের অন্যান্য দেশের সাহিত্যিক ও মহান চিন্তা নায়কদের রচনাও ছিল তাতে— জ্যাক লন্ডন, আপটন সিনক্লেয়ার, হেলেন কেলার,এইচ জি ওয়েলস, ফ্রয়েড, হ্যাভলক এলিস, এমিল জোলা প্রভৃতি। এই মহান (!) কর্ম শেষ করার পর উত্তেজিত ছাত্র জনতার সামনে হিটলারের প্রচার মন্ত্রী গোয়েবলস এক বক্তৃতায় বলেছিলেনঃ 'জার্মানির আত্মা আবার নিজেকে প্রকাশ করছে।এই যে আগুনের শিখা আমরা দেখতে পাচ্ছি তা শুধু পুরোনোকে ধ্বংস করবে না, তা আবাহন করবে নতুন চিন্তাকে।' (সূত্র, দি রাইজ 'এন্ড ফল অব দি থার্ড রাইখ, উইলিয়াম এল শাইরার,পৃষ্ঠা ২৪১, অ্যারো বুকস)

হিটলার ও তাঁর বাহিনী সুমহান জার্মান জাতিকে কোন সর্বনাশের অতল অন্ধকারে নিয়ে গিয়েছিলেন, তা আমরা এখন সবাই জানি।আমাদের দুর্ভাগ্য, সেই হিটলারি বাহিনী যেন নতুন রূপে,নতুন চেহারা নিয়ে বাংলার বুকে আবির্ভূত হয়েছে।বইয়ের স্থান যাদের হৃদয়ে নয়,পায়ের নিচে।নিজেদের সনাতনী বলে পরিচয় দেওয়া এই উন্মত্তের দল সভ্যতার সমস্ত রীতি নীতিকে অগ্রাহ্য করে উৎসবের আনন্দের দিনে, নেতাদের প্ররোচনায়, সারা রাত জেগে বইয়ের স্টল ভাঙ্গার কাজে আত্মনিয়োগ করেছে।এরা প্রশ্ন তুলছে, বিদ্যাসাগর, রবীন্দ্রনাথ,শরৎচন্দ্র কে? মার্ক্স - লেনিনের অবদান কি? হায়রে অবোধের দল।চিন্তা করার ন্যূনতম শক্তিও ওরা হারিয়ে ফেলেছে।

এইতো পশু। ওদের নেতারা 'ভাল করিয়াই জানে,মানুষকে অমানুষে পরিণত না করিলে,মানুষকে দিয়া অমানুষের কাজ করানো যায় না।

সামনে এরা— কিন্তু পিছনে যে অশুভ ফ্যাসিস্ট শক্তি এদের বিচারবোধহীন পশুতে পরিণত করেছে — তাঁদের ক্ষমা নেই।মানুষ সেই অশুভ ফ্যাসিস্ট শক্তিকে সমূলে বিনাশ করবেই।

আর্ন্তজাতিক

ইউরোপে যুবসমাজের বিদ্রোহ, মার্কিন মধ্যবর্তী নির্বাচনে ট্রাম্পের জনপ্রিয়তায় ধ্বস

সৌর বসু

ইউরোপের যুবসমাজের বিদ্রোহ : অর্থনৈতিক দুর্দশা, রাজনৈতিক মোহভঙ্গ এবং পশ্চিম এশিয়ার সংকটের ফলে ইউরোপের বিভিন্ন দেশে প্রতিবাদ আন্দোলন ক্রমশ ছড়িয়ে পড়ছে। মূল্যবৃদ্ধি, শিক্ষার মানের অবনতি, বেকারত্ব এবং বাড়িভাড়ার আকাশছোঁয়া বৃদ্ধির প্রতিবাদে হাজার হাজার যুবক-যুবতী রাস্তায় নেমে আসছেন। গত কয়েক দশকে ইউরোপের যুবসমাজের মধ্যে এমন ব্যাপক অসন্তোষ খুব কমই দেখা গিয়েছে। আলবেনিয়াতেও তীব্র রাজনৈতিক অস্থিরতা সৃষ্টি হয়েছে। স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠছে, এই ক্রমবর্ধমান প্রতিবাদ ও অসন্তোষের পিছনে আসল কারণ কী ?

ফ্রান্স, ইতালি ও স্পেন ইউরোপের অপেক্ষাকৃত সমৃদ্ধ দেশগুলির অন্যতম। কিন্তু অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি সত্ত্বেও এই দেশগুলির বহু যুবক-যুবতী তাঁদের মৌলিক সমস্যাগুলির সমাধানে সরকারের সক্ষমতার উপর আস্থা হারিয়েছেন। জীবনযাত্রার ক্রমবর্ধমান ব্যয়, নিরাপদ ও ভালো বেতনের চাকরির অভাব, মানসম্মত শিক্ষার সুযোগের সীমাবদ্ধতা এবং আবাসনের বিপুল খরচ তাঁদের মধ্যে হতাশা ও ক্ষোভের জন্ম দিয়েছে। যুবসমাজের মধ্যে ক্রমশ এই ধারণা দৃঢ় হচ্ছে যে, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও জাতীয় সমৃদ্ধির সুফল সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছচ্ছে না। দেশের সামগ্রিক উন্নয়ন তাঁদের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে কার্যকর ভূমিকা নিতে ব্যর্থ হচ্ছে।

এই অসন্তোষের প্রতিফলন শুধু ইউরোপেই সীমাবদ্ধ নয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেও প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের নীতি এবং তাঁর সমালোচকদের মতে, ক্রমবর্ধমান স্বৈরাচারী মনোভাব ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জোরদার হয়েছে। তাঁর 'মেক আমেরিকা গ্রেট এগেন' (আমেরিকাকে আবার মহান করে তোলো) স্লোগানের পাশাপাশি আমদানির উপর বিপুল শুল্ক আরোপ, আগ্রাসী বাণিজ্যনীতি এবং আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে সংঘাতমূলক অবস্থান বিশ্বজুড়ে বিতর্কের সৃষ্টি করেছে। এসব নীতির ফলে বিশ্ব অর্থনীতির উপর কী ধরনের প্রভাব পড়তে পারে, তা নিয়েও উদ্বেগ বাড়ছে।

পশ্চিম এশিয়ায় কৌশলগত আধিপত্য বজায় রাখার চেষ্টা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র দীর্ঘদিন ধরেই করে আসছে। বিপুল তেলসম্পদ এবং গুরুত্বপূর্ণ ভূ-রাজনৈতিক অবস্থানের কারণে এই অঞ্চল আমেরিকার কাছে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। সৌদি আরব, সংযুক্ত আরব আমিরশাহি, কুয়েতসহ অন্যান্য তেল উৎপাদনকারী দেশের সঙ্গে আমেরিকার সম্পর্ক ঐতিহাসিকভাবে তার আঞ্চলিক কৌশলের অন্যতম ভিত্তি। তবে বর্তমানে এই দেশগুলি ক্রমশ স্বাধীন বিদেশনীতি গ্রহণ করছে। তারা শুধু ওয়াশিংটনের উপর নির্ভরশীল না থেকে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে নিজেদের অংশীদারিত্বের পরিধি বাড়াতে আগ্রহী।

অন্যদিকে, ইরান পশ্চিম এশিয়ায় আমেরিকার প্রভাব বিস্তারের পথে একটি বড় প্রতিবন্ধক হয়ে উঠেছে। তেহরান ও ওয়াশিংটনের দীর্ঘস্থায়ী সংঘাতের পিছনে রয়েছে আঞ্চলিক নিরাপত্তা, জ্বালানি সম্পদ, সামরিক জোট এবং পরস্পরবিরোধী ভূ-রাজনৈতিক স্বার্থের জটিল দ্বন্দ্ব। এই সংঘাত শুধু দুই দেশের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নেই, সমগ্র অঞ্চলের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতাকে তা প্রভাবিত করছে।

প্যালেস্টাইন সম্পর্কে ইজরায়েলের নীতি, বিশেষত গাজা ভূখণ্ডে তার সামরিক অভিযান, পশ্চিম এশিয়ার উত্তেজনাকে আরও তীব্র করেছে। গাজায় ভয়াবহ ধ্বংসযজ্ঞ এবং নারী ও শিশুসহ হাজার হাজার প্যালেস্টাইনি নাগরিকের মৃত্যু আন্তর্জাতিক মহলে ব্যাপক নিন্দার জন্ম দিয়েছে।

গাজাকে একটি উন্নয়ন ও পর্যটনকেন্দ্রে রূপান্তরিত করার জন্য প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের প্রস্তাবও গভীর বিতর্কের সৃষ্টি করেছে। প্যালেস্টাইনি জনগণের ভবিষ্যৎ কী হবে, নিজেদের মাতৃভূমিতে বসবাসের অধিকার কীভাবে সুরক্ষিত থাকবে এবং এই ধরনের পরিকল্পনার পিছনে বাণিজ্যিক স্বার্থ কতটা প্রাধান্য পাচ্ছে;এসব প্রশ্ন আজ আন্তর্জাতিক রাজনীতির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

মার্কিন মধ্যবর্তী নির্বাচন ও ট্রাম্পের রাজনৈতিক ধাক্কা

এই সামগ্রিক রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতির মধ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যবর্তী নির্বাচন বিশেষ তাৎপর্য বহন করছে। ট্রাম্প প্রশাসনের নীতি, ইরানের সঙ্গে যুদ্ধের প্রভাব, নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রীর মূল্যবৃদ্ধি, দুর্নীতির অভিযোগ এবং কঠোর অভিবাসন নীতি;সব মিলিয়ে রিপাবলিকান পার্টির নির্বাচনী অবস্থান দুর্বল হয়েছে। নির্বাচনী ফলাফল ট্রাম্পের রাজনৈতিক কর্তৃত্বের উপর একটি বড় ধাক্কা হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে।

দ্বিতীয়বার ক্ষমতায় আসার পর প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প তাঁর রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কর্মসূচি বাস্তবায়নে একের পর এক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন। কিন্তু তাঁর শুল্কনীতি বিশ্ব অর্থনীতিতে অস্থিরতা সৃষ্টি করেছে। ইরানের বিরুদ্ধে সামরিক অভিযান এবং গাজা ভূখণ্ড থেকে প্যালেস্টাইনি জনগণকে উচ্ছেদের প্রচেষ্টা আন্তর্জাতিক মহলে তীব্র সমালোচনার মুখে পড়েছে। একই সঙ্গে আমেরিকার অভ্যন্তরেও তাঁর অর্থনৈতিক নীতির বিরূপ প্রভাব সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রাকে কঠিন করে তুলেছে।

ইরানের সঙ্গে যুদ্ধের প্রভাবে জ্বালানি ও নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রীর মূল্যবৃদ্ধি মার্কিন নাগরিকদের জীবনযাত্রার উপর বাড়তি চাপ সৃষ্টি করেছে। সাধারণ মানুষের পক্ষে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্র কেনা ক্রমশ কঠিন হয়ে উঠেছে। ভোটারদের উপর পরিচালিত একটি সমীক্ষায় প্রকাশ পেয়েছে, প্রতি দশজন ভোটারের মধ্যে আটজন মনে করেন, গত এক বছরে মূল্যবৃদ্ধি তাঁদের জীবনকে দুর্বিষহ করে তুলেছে। সমীক্ষায় অংশগ্রহণকারীদের প্রায় ৬০ শতাংশ এই পরিস্থিতির জন্য ডোনাল্ড ট্রাম্পকে দায়ী করেছেন বলে বিবিসি-র প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে। এই পরিসংখ্যান থেকে বোঝা যায়, অর্থনৈতিক অসন্তোষ কীভাবে রাজনৈতিক ক্ষোভে পরিণত হয়েছে।

ট্রাম্পের কঠোর অভিবাসন নীতিও রিপাবলিকানদের নির্বাচনী সাফল্যের পথে বড় বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। মেক্সিকো সীমান্তে সেনা মোতায়েনের পক্ষে মার্কিন নাগরিকদের একাংশের সমর্থন থাকলেও, ভিসা ও আশ্রয়ের আবেদন স্থগিত রাখা এবং বিপুলসংখ্যক অভিবাসীকে আটক করে রাখার নীতি নিয়ে ব্যাপক অসন্তোষ তৈরি হয়েছে। অভিবাসন প্রশ্নে সরকারের কঠোর অবস্থান অনেক ভোটারের কাছেই অগ্রহণযোগ্য হয়ে উঠেছে। মধ্যবর্তী নির্বাচনে তার প্রতিফলন ঘটেছে।

এ ছাড়া রিপাবলিকান প্রার্থীদের নির্বাচনী কৌশলেও দুর্বলতা পরিলক্ষিত হয়েছে। বিশেষত টেক্সাসের রিপাবলিকান প্রার্থীরা তাঁদের প্রচারের মাধ্যমে সাধারণ ভোটারদের আস্থা অর্জন করতে পারেননি। নাগরিকদের দৈনন্দিন সমস্যা ও উদ্বেগকে যথাযথ গুরুত্ব দিতে তাঁরা ব্যর্থ হয়েছেন। অন্যদিকে, ডেমোক্র্যাট প্রার্থীরা অভিবাসন, অর্থনৈতিক সংকট এবং সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার সমস্যাগুলিকে নির্বাচনী প্রচারের কেন্দ্রে নিয়ে আসতে সক্ষম হয়েছেন।

হিস্পানিক অধ্যুষিত এলাকাগুলিতে ডেমোক্র্যাট প্রার্থীদের সাফল্য বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ। কানসাস, টেক্সাস এবং সাউথ ক্যারোলিনার মতো রিপাবলিকানদের শক্ত ঘাঁটিতেও ডেমোক্র্যাটরা গুরুত্বপূর্ণ আসনে সাফল্য পেয়েছেন বলে নির্বাচনী বিশ্লেষণে উঠে এসেছে। মিশিগানে ট্রাম্পের মনোনীত প্রার্থীর পরাজয়ও রিপাবলিকান শিবিরের কাছে বড় ধাক্কা হিসেবে বিবেচিত হয়েছে।

২০২৪ সালে ট্রাম্পের দ্বিতীয়বার ক্ষমতায় প্রত্যাবর্তনের পিছনে কৃষ্ণাঙ্গ ও হিস্পানিক ভোটারদের একটি অংশের সমর্থন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। কিন্তু ক্ষমতায় আসার পর তাঁর কঠোর অভিবাসন নীতি এবং অর্থনৈতিক সিদ্ধান্তের কারণে এই ভোটারদের একাংশের মধ্যে হতাশা তৈরি হয়েছে। হিস্পানিক অধ্যুষিত এলাকাগুলিতে ডেমোক্র্যাট প্রার্থীদের তুলনামূলক বেশি ভোটপ্রাপ্তি সেই অসন্তোষেরই প্রতিফলন বলে বিশেষজ্ঞদের একাংশ মনে করছেন। নিউ ইয়র্ক টাইমসের বিশ্লেষণেও এই পরিবর্তনের ইঙ্গিত পাওয়া গিয়েছে। কৃষ্ণাঙ্গ অধ্যুষিত এলাকাগুলিতেও একই ধরনের প্রবণতা লক্ষ্য করা গেছে।

নির্বাচনের ফলাফল: ভবিষ্যৎ রাজনীতির দিশা

এখন স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠছে, মধ্যবর্তী নির্বাচনে ট্রাম্পের রিপাবলিকান পার্টির পরাজয়ের ফলে আমেরিকার অভ্যন্তরীণ রাজনীতি এবং বিদেশনীতি;কোনও ক্ষেত্রেই কি পরিবর্তন আসবে? নির্বাচনী ধাক্কার পর ট্রাম্পের রাজনৈতিক মনোভাব ও প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের ধরনে কী পরিবর্তন ঘটে, তা বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। তিনি কি নিজের নীতির পুনর্মূল্যায়ন করবেন, নাকি আরও কঠোর অবস্থান গ্রহণ করবেন, সেটাই এখন দেখার বিষয়।

বিদেশনীতির ক্ষেত্রেও এই নির্বাচনের প্রভাব সুদূরপ্রসারী হতে পারে। বিশ্ব অর্থনীতির বর্তমান সংকট, ইউরোপের রাজনৈতিক ও

অর্থনৈতিক অস্থিরতা, পশ্চিম এশিয়ার যুদ্ধ পরিস্থিতি, ইরান সংঘাতের পরিণতি এবং রাশিয়া, চিন ও আমেরিকার মতো শক্তিধর রাষ্ট্রগুলির পারস্পরিক সম্পর্কের সমীকরণ;সবকিছুই আন্তর্জাতিক রাজনীতির ভবিষ্যৎ গতিপথ নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে।

ইজরায়েলের নির্বাচন : আগ্রাসী নেতানিয়াহুকে প্রত্যাখ্যান করলেন দেশের জনগণ

মনিরুল হক

ইজরায়েলের পার্লামেন্ট 'নেসেট'-এর বহু প্রতীক্ষিত নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় গত ২৭ অক্টোবর, ২০২৬ তারিখে এবং তার পর পরই ভোট গণনাও শেষ হয়েছে। নির্বাচনের ফলাফলেই প্রমাণ, ইজরায়েলের জনগণ তাদের দুর্নীতিগ্রস্ত, আগ্রাসী যুদ্ধবাজ প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুকে প্রত্যাখ্যান করেছেন, তাঁর জোটকে পরাজিত করেছেন। দেখা গেল ১২০ সদস্য বিশিষ্ট সংসদে দোর্দন্ড প্রতাপশালী নেতানিয়াহুর জোটের সদস্য সংখ্যা ৬৪ থেকে ৫৩ তে নেমে এসেছে। তাদের ভোট শতাংশও ৫৪ থেকে কমে ৪২ এসে ঠেকেছে। নেতানিয়াহুর দল লিকুদ পার্টির আসনও ৩২ থেকে কমে হয়েছে ২৭। ৭ অক্টোবর ২০২৩-এ হামাসের প্রাণঘাতী হামলার জবাব নেতানিয়াহু যে ভাবে দিয়েছিলেন তা যে ইজরায়েলের জনগণ মেনে নেয় নি তা এই ফলাফল থেকেই বোঝা যায়। দেশের মধ্যে মূল্যবৃদ্ধি, প্রকৃত আয় কমে যাওয়া, যুদ্ধের কারণে মানবসম্পদ ও অন্যান্য সম্পদের ক্ষয়ক্ষতি, অনিশ্চয়তা, হামাস আক্রমণের যথাযথ তদন্ত না করা, দীর্ঘদিন ধরে যুদ্ধের আবহাওয়ার মধ্যে বসবাস করা, জনমতকে উপেক্ষা করা প্রভৃতির কারণে দেশের মানুষ নেতানিয়াহুকেই দায়ী করেছেন। এ ছাড়াও তাঁর বিরুদ্ধে ঘুষ, জালিয়াতি ও আস্থাভঙ্গের তিনটি সুনির্দিষ্ট অভিযোগের বিচার চলছে দেশের আদালতে। বিচারে দোষী সাব্যস্ত হলে তাঁর ১০ বছরের কারাবাসও হতে পারে। আর গাজার গণহত্যা এবং সেখানে ত্রাণ সামগ্রী ঢুকতে বাধা দেওয়ার অপরাধে আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালত তো তাঁর বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করেই রেখেছে। এই অবস্থায় নির্বাচনে তাঁর পরাজয় ছিল কাঙ্খিত, ঘটলও তাই।

নেতানিয়াহু যে কতোটা জনপ্রিয়তা হারিয়েছেন তা আরও একটি তথ্য দিয়ে বিচার করা যায়। ১৯৭৩ সাল থেকে এপর্যন্ত ১৯ টি নির্বাচনে অংশগ্রহণ করা লিকুদ পার্টি এবাছে যে ভোট পেয়েছে শতাংশের হারে তা তৃতীয় সর্বনিম্ন অথচ ১৯৯৯ সালের পর এই বছরেই ভোট পড়েছে সবচেয়ে বেশি। অপরদিকে তাঁর প্রধান প্রতিপক্ষ গদি আইজেনকোট যিনি একজন প্রাক্তন সেনাকর্তা, তাঁর দলটাই গঠন করেছেন এই সে দিন, ২০২৫ সালের ১৬ সেপ্টেম্বর তারিখে। তাঁর দল ইয়াশার পার্টি পেয়েছে ২১ টি আসন এবং তাঁর জোট পেয়েছে মোট ৪৮ টি আসন।

ইয়াশার পার্টি একটি মধ্যপন্থী দল কিন্তু তারাও ফিলিস্তিনিদের সমানাধিকার স্বীকার করে না, আলাদা ফিলিস্তিনি রাষ্ট্রের কথা তো দূর অস্ত। তাদের স্বপ্ন, ইজরায়েল হবে একটি সমৃদ্ধ ইহুদি মডেল রাষ্ট্র। এখনও বিদেশে বসবাসরত ইহুদিদের তারা দেশে ডেকে নিতে চায়। তাদের লক্ষ্য আগামী ১০ বছরে ১০ লক্ষ এবং ২০৪৮ সাল, যা নাকি ইজরায়েল রাষ্ট্রের শতবর্ষপুর্তির বছর তার মধ্যে আরও ১০ লক্ষ ইহুদি ইজরায়েলে ফিরে আসুক। তারা চায় সামরিক সংস্কার। তবে তাদের যে দাবিটি নির্বাচনে সবচেয়ে বেশি আলোড়ন তুলেছিল তা হল, ৭.১০,২৩ তারিখে হামাসের আক্রমণের তদন্ত সঠিকভাবে করা ও তার রিপোর্ট প্রকাশ করা। তাদের মতো ইজরায়েলের অনেক মানুষই মনে করেন ওই আক্রমণের সঠিক তদন্ত হলে নেতানিয়াহু আরও একপ্রস্থ বিপাকে পড়বেন।

ইজরায়েলের ১২০ আসনের সংসদে সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেতে দরকার ৬১ টি আসন কিন্তু যুযুধান দুই পক্ষের কেউই সেই কাঙ্খিত সংখ্যায় পৌঁছতে পারে নি। এখন সবার নজর পড়েছে তৃতীয় পক্ষের দিকে। তৃতীয় পক্ষে আছে দুটো গ্রুপ। একটি হল ইউনাইটেড আরব লিষ্ট এবং অপরটি হল জয়েন্ট লিষ্ট। প্রথমটি জিতেছে ৮ টি আসনে এবং পরেরটি জিতেছে ১১টি আসনে। এরা কেউই নেতানিয়াহুকে সমর্থন দেবে না। প্রাথমিক ভাবে তারা গদি আইজেনকোটকে সমর্থন করবে বলে সে দেশের রাষ্ট্রপতি আইজ্যাক হারজোগকে জানিয়েছে। আরব লিষ্ট কোন সমঝোতা ছাড়াই গদি আইজেনকোটকে সমর্থন দেবে বলে ঘোষনা করেছে কিন্তু জয়েন্ট লিষ্ট কিছু নির্দিষ্ট কর্মসূচির উপর ভিত্তি করেই আইজেনকোটের সঙ্গে সমঝোতা করবে বলে জানিয়েছে এবং তারা এও জানিয়েছে যে বোঝাপড়া নিয়ে ইনফর্মাল কথাবার্তা চলছে। যদিও আইজেনকোটের অন্যতম জোটসঙ্গী

ইজরায়েল বেইতেইনু দলের নেতা আভিগদর লিভারম্যান আরব দলগুলির সমর্থনে সরকার গঠনের পক্ষপাতী নন। তিনি বরং চান নেয়ানিয়াহুর সঙ্গে থাকা দক্ষিণপন্থী দলগুলির সমর্থন এবং তিনি তাদের সঙ্গে কথা বলেও প্রস্তুত।

আরব দলগুলি বিশেষ করে জয়েন্ট লিষ্টের মধ্যে আছে তিনটি গ্রুপ- হাদশ, তাআল এবং বালাদ। এরা বামপন্থী, ধর্মনিরপেক্ষ এবং যুদ্ধবিরোধী। এরা গাজা এবং ওয়েস্ট ব্যাঙ্কে ইহুদি আধিপত্য স্থাপনের বিরোধী, ফিলিস্তিনিদের প্রতি অবরোধের বিরোধী, ফিলিস্তিনিদের উচ্ছেদের বিরোধী, ফিলিস্তিনি এলাকায় নতুন ইহুদি সেটেলমেন্টের বিরোধী। এরা পরমাণু অস্ত্রের বিরোধী এবং মধ্যপ্রাচ্যকে যুদ্ধমুক্ত অঞ্চল হিসাবে গড়ে তুলতে আগ্রহী। এরা মুল্যবৃদ্ধি, বেসরকারী করণ ও বেকারির বিরুদ্ধে এবং ভ্যাট ও বাড়িভাড়ার হার কমানোর জন্য বড় বড় আন্দোলন সংঘটিত করেছে। এদের কর্মসূচিতে আছে আরব নাগরিকদের সমানাধিকার, ফিলিস্তিনি রাষ্ট্র গঠন এবং জেরুজালেমকে সেই রাষ্ট্রের রাজধানীর স্বীকৃতি দেওয়া। বলা বাহুল্য, এই দলগুলির মধ্যে মুসলিম এবং ইহুদি উভয় ধর্মাবলম্বীরাই আছেন কিন্তু এরা জায়নবাদের বিরোধী। অপরদিকে ইউনাইটেড আরব লিষ্ট এবং তাদের নেতা মনসুর আব্বাস তীব্র বাম বিরোধী। তিনি নিজেই বলেন ধর্মীয় বিষয়ে তিনি ডানপন্থী অর্থোডক্সদের অনেক কাছাকাছি। তিনি মনে করেন ইজরায়েল একটি প্রকৃত ইহুদি রাষ্ট্র এবং এই রাষ্ট্র বর্ণবাদের চর্চা করে না। তিনি হামাস আক্রমণেরও তীব্র নিন্দা করেন। কিন্তু তিনি চান ফিলিস্তিনি রাষ্ট্রের সম্ভবনাকে শক্তিশালী করতে এবং এর জন্য তিনি ইজরায়েল ও ফিলিস্তিন কতৃপক্ষের মধ্যে একটি কূটনীতিক বোঝাপড়ার গড়ে তুলতে আগ্রহী। তাঁর এই আগ্রহের জন্য মনসুর আব্বাসের নামও জায়নবদীদের কালো তালিকায় উঠে গেল। নির্বাচনের কিছুদিন আগে দেশের নির্বাচন কমিটির কাছে অভিযোগ গেল, এই দুটি গ্রুপই ইজরায়েলের অস্তিত্ব এবং তার গণতান্ত্রিক অবস্থানের বিরোধী এবং তারা সন্ত্রাসবাদের সমর্থক। নির্বাচন কমিটি তথ্য এবং সাক্ষ্য-প্রমাণ দেখে দুটি গ্রুপেরই নির্বাচনে অংশগ্রহণ করার ন্যায্য অধিকার বাতিল করে দিল। পরে সুপ্রীম কোর্টের রায়ে গ্রুপ দুটি নির্বাচনে অংশগ্রহণের অধিকার ফিরে পায়।

নির্বাচনের ফল বেরুবার পর দুটি বড় গ্রুপেরই অবস্থান ছিল, তারা আরব দলগুলির সমর্থন নেবে না। কিন্তু দেখা গেল নেতানিয়াহু গোপনে তাদের সমর্থন প্রার্থনা করছেন আর আইজেনকোট তো প্রকাশ্যে তাদের সম্পর্কে মধুমাখা কথা বলছেন। তিনি সংখ্যালঘু আরবদের প্রতি সম্মান দেখানোর আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি বলেছেন, 'ইজরায়েলের আরব নাগরিকরা দেশটির ইতিহাস ও পরিচয়ের অবিচ্ছেদ্দ অংশ।' বলেছেন, 'আরব দলগুলির প্রতিনিধিদের সঙ্গে মতভেদ থাকা সম্পূর্ণ বৈধ। তাদের কারও কর্মকান্ডের তীব্র বিরোধিতাও করা যেতে পারে কিন্তু একটি গোটা জনগোষ্ঠীকে হেয় করা বৈধ বা গ্রহণযোগ্য নয়। আমি তা হতে দেব না।'

গত ৮ নভেম্বর তারিখে রাষ্ট্রপতি আইজ্যাক হারজোগ তাঁর বাসভবনে এক অনুষ্ঠানে গদি আইজেনকোটের হাতে মন্ত্রীসভা গঠন করার আনুষ্ঠানিক আমন্ত্রণপত্র তুলে দিয়েছেন। ধরে নেওয়া হচ্ছে আইজেনকোট মন্ত্রীসভা গঠন করতে সমর্থ হবেন। সেক্ষেত্রে ইজরায়েলের অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক পরিবেশ কিছুটা পাল্টালেও বৈদেশিক নীতিতে তেমন বড় কোনো পরিবর্তন হবে এমন আশা কেউই করছেন না; যদিও সম্ভাব্য প্রধানমন্ত্রী গদি আইজেনকোটের পরামর্শে তত্বাবধায়ক প্রধানমন্ত্রী নেতানিয়াহু ইরান আক্রমণ আপাতত বন্ধ রেখেছেন।

ভ্রমণ

সুমাত্রা - যবদ্বীপের পথে বিপথে

সৌর বসু

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

২

২২ আগস্ট

সকালে ঘুম থেকে উঠে প্রাতরাশ সেরে ছুটেছি এয়ারপোর্টের উদ্দেশ্যে। আজ আমরা যাব যোগ্যকর্তা।

ঘণ্টাখানেক উড়ানের পর এয়ারপোর্টে নেমে দেখি, আমাদের জন্য হেরি অপেক্ষা করছে। তীক্ষ্ণ মুখাবয়ব, মাথায় স্থানীয় কায়দায় পাগড়ি বাঁধা। আমাকে দেখে জড়িয়ে ধরে গাড়িতে নিয়ে গিয়ে বসাল। বেলা তখন এগারোটা। বলল, আমরা যোগ্যকর্তার রাজপ্রাসাদ এবং আরও কয়েকটি আনুষঙ্গিক জায়গা ঘুরে হোটেলে যাব।

শান্ত, নিরিবিলি রাজপথ ধরে আমরা এগিয়ে চললাম।

প্রথমেই আমাদের নিয়ে যাওয়া হলো যোগ্যকর্তার সুলতানের প্রধান প্রাসাদে। প্রাসাদটি নির্মিত হয় ১৭৫৫ সালে। এটি বর্তমানে বিশ্ব ঐতিহ্য-সম্পত্তির অন্তর্ভুক্ত। বিশাল এলাকা জুড়ে প্রাসাদটির অবস্থান। প্রাসাদের বাইরে কিছু স্থানীয় মানুষ নানা হস্তশিল্পের বেচাকেনা করছে।

আমরা প্রাসাদের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে মুগ্ধ হয়ে গেলাম। ঢুকেই দু'পাশে চারদিক উন্মুক্ত বিশাল মণ্ডপ। মাথায় ঢালু ছাদ। এখানকার বেশিরভাগ বাড়ির ছাদই ঢালু হয়ে নেমে এসেছে। প্রাসাদের চারপাশ বৃক্ষশোভিত। একটি মণ্ডপের একপাশে নানা ধরনের বাদ্যযন্ত্র রক্ষিত আছে। হেরি, আমাদের গাইড, জানাল, এখানে বাদ্যযন্ত্র সহযোগে সংগীতের আসর বসে। এটি জাভা দ্বীপের সুলতানাতের ঐতিহাসিক প্রাসাদ।

বর্তমানে সুলতান এখানেই বসবাস করেন। সুলতানের দপ্তর এবং সাংস্কৃতিক কেন্দ্রও এই প্রাসাদ-চত্বরে অবস্থিত। বর্তমান সুলতান এখনও একটি সাংবিধানিক পদে অধিষ্ঠিত। প্রাসাদটি জাভার প্রথাগত স্থাপত্যের অন্যতম নিদর্শন। মণ্ডপগুলির স্থাপত্যে বৌদ্ধ স্থাপত্যের প্রভাব লক্ষ করা যায়। রাজপ্রাসাদ-চত্বরে একটি জাদুঘরে রাজপরিবারের পোশাকসহ বিভিন্ন মূল্যবান সামগ্রী রক্ষিত আছে।

রাজপ্রাসাদ থেকে বের হয়ে আমরা যোগ্যকর্তার 'ওয়াটার ক্যাসেল'-এ গেলাম। এখানে একটি চমৎকার উদ্যান এবং স্নানাগার আছে। এটি সপ্তদশ শতাব্দীর দ্বিতীয় ভাগে নির্মিত হয়।

ওয়াটার ক্যাসেল দেখে আমরা খাবারের সন্ধানে বের হলাম। শহরটির রাস্তাঘাট খুব সুন্দর। পথ চলার ক্লান্তি অনুভূত হয় না। দু'পাশে ছোট ছোট দোকানঘর, ছোট ছোট বাড়ি, তাদের ঢেউখেলানো ছাদ;সব মিলিয়ে মনে গভীর প্রশান্তি এনে দেয়। আকাশচুম্বী বাড়ি চোখে পড়ে না।

যোগ্যকর্তার বাড়িগুলির স্থাপত্যের সঙ্গে এখানকার মানুষের জীবনবোধের গভীর সংযোগ রয়েছে। জাভানিজদের আধ্যাত্মিক জীবন, মূল্যবোধ এবং প্রকৃতির সঙ্গে তাদের দৈনন্দিন জীবনযাপনের যে সম্পর্ক, তার প্রতিফলন ঘটেছে বাড়িগুলির নকশা ও বিন্যাসে। এখানকার বাড়িগুলির উঁচু ছাদেরও একটি তাৎপর্য আছে। একে এখানে 'জোগলো' ছাদ বলা হয়। উঁচু ছাদের সঙ্গে মানুষের আকাঙ্ক্ষা এবং আধ্যাত্মিক উন্নতির সম্পর্ক জড়িত বলে মনে করা হয়।

যোগ্যকর্তা জাভানিজ সংস্কৃতির একটি গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র। এখানকার বাটিক, পুতুলনাচ, নাটক ও সাহিত্য বিশেষ মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত। যোগ্যকর্তার একটি অঞ্চলে এখনও রাজতন্ত্র বিরাজ করছে। ইন্দোনেশিয়ার জাতীয় বিপ্লবের সময়, ১৯৪৬ থেকে ১৯৪৮ সাল পর্যন্ত, যোগ্যকর্তা ইন্দোনেশিয়ার রাজধানী ছিল।

শহরটি ইন্দোনেশিয়ার শিক্ষাকেন্দ্র হিসাবেও খ্যাতি অর্জন করেছে। অনেক স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে । এর মধ্যে গাজাহ মাদা বিশ্ববিদ্যালয় ইন্দোনেশিয়ার অত্যন্ত মর্যাদাপূর্ণ একটি প্রতিষ্ঠান।

আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় তাঁর 'দ্বীপময় ভারত' বইটিতে যবদ্বীপ সম্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে জানিয়েছেন, যবদ্বীপের সংস্কৃতিতে কতটা ভারতীয় উপাদান আর কতটা ইন্দোনেশীয় উপাদান রয়েছে, সে বিষয়ে তাঁর পাকু আলামের সঙ্গে আলোচনা হয়েছিল। পাকু আলামের মতে, যবদ্বীপীয় প্রকৃতিতে যে অন্তর্মুখী ভাব; mysticism;আছে, সেটি ইন্দোনেশীয় মনোভাবপ্রসূত। খ্রিস্টীয় মধ্যযুগে পশ্চিম ইউরোপে বা জার্মানিতে parsiful এক ধর্মবীর, এক মরমিয়া যোদ্ধা হয়ে দাঁড়ান, যবদ্বীপে মহাভারতের অর্জুনের চরিত্র তেমনি আধ্যাত্মিক সাধনার প্রতীক হয়ে একটি mystic character -এ পরিণত হয়েছে। এটি ইন্দোনেশীয় প্রকৃতির প্রভাবজাত বলে তাঁর মনে হয়।

যোগ্যকর্তা নামটির বিষয়েও আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় 'দ্বীপময় ভারত'-এ উল্লেখ করেছেন যে, পূর্বে যোগ্যকর্তার নাম ছিল অযোধ্যা; পরবর্তীকালে তা অপভ্রংশ হতে হতে ক্রমশ যোগ্যকর্তায় এসে পৌঁছেছে।

আমাদের হোটেলে এসে পৌঁছতে বেলা চারটে বেজে গেল।

যবদ্বীপের একটি প্রধান বাজার-সংলগ্ন এলাকায়, একটি অপরিসর রাস্তার উপরে হোটেলটি অবস্থিত। হোটেলটিকে দেখে অভিজাত শ্রেণির বলেই মনে হলো। সমগ্র এলাকাটিতে ইউরোপীয় নারী-পুরুষ ঘুরে বেড়াচ্ছে। এলাকাটি অনেকটা কাঠমান্ডুর থামেলের মতো বলে মনে হলো। রাস্তাটি অপরিসর হলেও হোটেলের সামনে অনেকটা জায়গা জুড়ে গাড়ি রাখার ব্যবস্থা রয়েছে।

আমাদের জন্য দ্বিতলে একটি ঘর সংরক্ষিত ছিল। ঘরটি চমৎকার। ব্যবস্থাপনা এবং আসবাবপত্রে কোনো ত্রুটি নেই। হাত বাড়ালেই সমস্ত কিছু পাওয়া যাচ্ছে;টেবিল, চেয়ার, তোয়ালে, আলমারি, হ্যাঙ্গার, জলের গ্লাস, চায়ের কেটলি, চায়ের পাতা এবং কফি প্রভৃতি।

সারাদিন ঘুরে বেড়িয়ে আমরা কিছুটা পরিশ্রান্ত। কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে আবার বেরিয়ে পড়লাম। আমাদের হোটেলের বারান্দা থেকেই দেখতে পাচ্ছিলাম, সামনের রাস্তা জুড়ে অনুষ্ঠান চলছে। খবর নিয়ে জানা গেল, ইন্দোনেশিয়ার স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে ওই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। বেশ গান-বাজনা চলছে।

আমরা পথে নেমে অপরিসর রাস্তা দিয়ে হাঁটতে শুরু করলাম। রাস্তা দিয়ে অনর্গল গাড়ি চলছে। বড় বড় বাস ইউরোপীয় পর্যটকদের আমাদের হোটেলের সামনে এসে নামিয়ে দিচ্ছে। সরু রাস্তা দিয়ে ক্রমাগত গাড়ি চলাচলের ফলে হাঁটতে আমার বেশ অসুবিধা হচ্ছে।

খানিক এগিয়েই একটি কফির দোকানে দাঁড়ালাম। কিন্তু সেখানে তখন কফি পাওয়া যাবে না। উল্টো দিকের দোকানে ইন্দোনেশিয়ার রুপি না থাকার ফলে কফি পাওয়া গেল না। আরেকটু এগিয়েই একটি বাড়ির সামনে কয়েকজন মহিলা বসে আছেন। আমরা এগিয়ে যেতেই একজন উঠে এলেন। ইন্দোনেশিয়ায় কথাবার্তা চালানোর প্রধান অন্তরায় ভাষা। কিন্তু এই তরুণী চমৎকার ইংরেজি বলেন। তিনি আমাদের জানালেন, আরও দুটো বাড়ি এগোলেই ডান হাতে একটি কফির দোকান পাওয়া যাবে। কফি খাওয়াই যে আমাদের মূল উদ্দেশ্য, তা নয়। একটু চারপাশ ঘুরে দেখা এবং স্থানীয় লোকজনের সঙ্গে ভাঙা ভাঙা ইংরেজিতে আলাপ করাই আমাদের প্রকৃত উদ্দেশ্য।

দোকানটি খুব বড় নয়। দু-তিনজন স্থানীয় মানুষ ইতস্তত ছড়িয়ে-ছিটিয়ে বসে আছেন। আমরা কাউন্টারে গিয়ে কফি এবং কেক অর্ডার করলাম। ইন্দোনেশিয়ার কফির বেশ নাম আছে। যে ছেলেটি এবং মেয়েটি কাউন্টারে ছিল, তাদের সঙ্গে দু-চারটে কথা হলো। জানা গেল, এখন এখানে পর্যটকদের আনাগোনা খুব বেশি। তাঁদের মধ্যে বেশিরভাগই ইউরোপীয়।

দোকানঘরটির সামনে প্রশস্ত বারান্দা। সেখানে চেয়ার-টেবিল পাতা। আমরা বারান্দাতেই বসলাম। সামনে দিয়ে বড় রাস্তা চলে গেছে। অনেক গাড়ি, মানুষের চলাচল। দোকানটির দেওয়ালে নানা ধরনের ছবি আঁকা। ধীরে ধীরে দোকানটিতে ভিড় বাড়তে লাগল। অনেকেই এখানে রাতের খাবার খেতে এসেছে। এরা মূলত পর্যটক।

আমরা এখানে কিছুক্ষণ সময় কাটিয়ে হোটেলে ফিরে এলাম। ফেরার পথে সেই ইংরেজি জানা মেয়েটিকে ধন্যবাদ জানিয়ে এলাম।

হোটেলে ফিরে সুইমিংপুলের পাশ দিয়ে সোজা রেস্তোরাঁয় গিয়ে উপস্থিত হলাম। সুইমিংপুলের ধারে অনেক চেয়ার পাতা। সেখানে সাহেব-মেমসাহেবরা গল্প করছে, অনেকে সুইমিংপুলে সাঁতার কাটছে, কেউ কেউ বই হাতে বসে রয়েছে।

আমরা সামুদ্রিক মাছ এবং তার সঙ্গে নানা ধরনের সবজি খেলাম। শুরুতে আমি একটি ব্ল্যাক লেবেল হুইস্কি এবং সুতপা একটি ভার্জিন মোজিটো পান করল। সুইমিংপুল-সংলগ্ন রেস্তোরাঁটির পরিবেশ খুব সুন্দর ছিল।

বোরোবুদুরের পথে

পরের দিন সকাল সকাল ব্রেকফাস্ট সেরে রিসেপশনে এসে দেখি, আমাদের গাইড হেরি বসে রয়েছে। হেরি জানাল, আমাদের অনেক দূর যেতে হবে। রাস্তায় যানজটের সম্ভাবনা রয়েছে। কাজেই আমাদের সত্বর বেরিয়ে পড়া উচিত।

আমরা প্রথমেই যাব বোরোবুদুর। সেখান থেকে প্রামবানান হয়ে হোটেলে ফিরে আসব। মাঝে রাস্তায় কোথাও খাওয়া-দাওয়া করে নেব। হেরিকে জানালাম, ফেরার পথে আমরা পাকু আলাম রাজপ্রাসাদ পরিদর্শন করব। এই প্রাসাদেই রবীন্দ্রনাথ ১৯২৭ সালে যোগ্যকর্তা ভ্রমণের সময় অবস্থান করেছিলেন।

স্থানীয় মানুষদের দেখলাম, রবীন্দ্রনাথের নামের সঙ্গে তাঁরা খুব একটা পরিচিত নন। জওহরলাল নেহরু নামটি তাঁদের কাছে বরং বেশি পরিচিত ও আদরণীয়।

বোরোবুদুর প্রায় দু'ঘণ্টার পথ। তার মধ্যে কিছুটা সময় নষ্ট হলো, কারণ রাস্তা জুড়ে ইন্দোনেশিয়ার স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপিত হচ্ছে।

আমরা বেলা প্রায় এগারোটা নাগাদ বোরোবুদুর প্রাঙ্গণে এসে পৌঁছলাম। এখানে আমাদের গাড়ি ছেড়ে দিতে হলো। এটি এখন ইউনেস্কোর বিশ্ব ঐতিহ্য-কমপ্লেক্স। বিশাল এলাকাটি চমৎকারভাবে সাজানো হয়েছে। মন্দিরের কাছে পৌঁছানোর জন্য নানাবিধ ব্যবস্থা রয়েছে। ইলেকট্রিক বাস রয়েছে, হুইলচেয়ারের ব্যবস্থাও আছে। বৃক্ষশোভিত সমগ্র অঞ্চলটি সত্যিই মনোমুগ্ধকর।

এখানে মন্দিরের ভিতরে প্রবেশ করার জন্য কারুকার্যমণ্ডিত বিশেষ এক ধরনের চটি ব্যবহার করতে হয়। চটিটি দেখতে অনেকটা খড়মের মতো। পায়ে গলিয়ে চমৎকার হাঁটা যায়।

কিছুদূর এগোবার পরেই দূর থেকে বোরোবুদুরের মন্দিরটি চোখে পড়ল। মনে পড়ে গেল সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের 'আমরা বাঙালি' কবিতার লাইনটি;

'স্থপতি মোদের স্থাপনা করেছে বরবুদুরের ভিত্তি।'

কিছুটা দূরে দাঁড়িয়ে বোরোবুদুরের শোভা দেখছিলাম। একটি টিলার উপর মন্দিরটি স্থাপন করা হয়েছে। এটি বৌদ্ধ স্থাপত্যের একটি অনন্য কীর্তি। শৈলেন্দ্র রাজবংশের আমলে অষ্টম থেকে নবম শতাব্দীর মধ্যে নির্মিত এই সৌধটি ধাপে ধাপে উপরে উঠে গিয়ে একটি পিরামিডসদৃশ আকার ধারণ করেছে।

সৌধটির গায়ে পাথরে খোদাই করা বুদ্ধমূর্তি, জাতকের কাহিনি এবং জাভানিজদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার ছবি উৎকীর্ণ রয়েছে। সৌধটির সর্বোচ্চ স্তরে অনেকগুলি বুদ্ধস্তূপ রয়েছে এবং তার অভ্যন্তরে রয়েছে বুদ্ধমূর্তি। সৌধটির দেওয়ালের গায়ে থাকা বুদ্ধমূর্তিগুলির অনেকগুলিই আর অক্ষত নেই।

সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় তাঁর 'দ্বীপময় ভারত'-এ বোরোবুদুরের বৌদ্ধ মন্দির দর্শন করে লিখেছেন, বড়বুদুর, প্রামবানান প্রভৃতি প্রাচীন যুগের যবদ্বীপীয় মন্দিরগুলির ভাস্কর্যকে যাকে বলে ক্লাসিক স্টাইলের

সরল, উদার, অনাড়ম্বর ভাব;এগুলি ভাস্কর্যশিল্পের ধ্রুপদ চূড়া। পরবর্তী যুগের যবদ্বীপীয় আর বালিদ্বীপীয় ভাস্কর্যে এই ক্লাসিক ডিগনিটি, প্রাচীনের সেই বিরাট গাম্ভীর্য আর রইল না। ভাস্কর্য খুব কারিগরি করা টপ্পা-ঠুমরিতে রূপান্তরিত হলো।

রবীন্দ্রনাথ ইন্দোনেশিয়ায় গিয়েছিলেন ১৯২৭ সালে। তাঁর সঙ্গে গিয়েছিলেন সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, সুরেন কর এবং ধীরেন্দ্রকৃষ্ণ দেববর্মা। রবীন্দ্রনাথ ইন্দোনেশিয়ায় এক মাসেরও বেশি সময় ধরে ভ্রমণ করেছেন। তাঁর 'জাভা-যাত্রীর পত্র'-এ তিনি ইন্দোনেশিয়া ভ্রমণের বর্ণনা তুলে ধরেছেন। মোট ২১টি পত্রে তিনি তাঁর ভ্রমণের ছবি এঁকেছেন।

বোরোবুদুরে তিনি এসে পৌঁছান ১৯২৭ সালের ২৬ সেপ্টেম্বর। সেখান থেকে মীরা দেবীকে লেখা একটি চিঠিতে তিনি বোরোবুদুর সম্পর্কে লিখেছেন;

'এর আগে বোরোবুদুরের ছবি অনেকবার দেখেছি। তার গড়ন আমার চোখে কখনই ভালো লাগেনি। আশা করেছিলাম , হয়তো প্রত্যক্ষ দেখলে এর রস পাওয়া যাবে; কিন্তু মন প্রসন্ন হলো না। ... মনে হয় যেন পাহাড়ের মাথার উপরে একটা পাথরের ঢাকনা চাপা দিয়েছে। এটা যেন কেবলমাত্র একটা আঁধারের মতো বহু শত বুদ্ধমূর্তি ও বুদ্ধের জাতককথার ছবিগুলি বহন করবার জন্য মস্ত একটি ডালি। সেই ডালি থেকে তুলে তুলে দেখলে অনেক ভালো জিনিস পাওয়া যায়। পাথরে খোদা জাতকমূর্তিগুলি আমার ভারি ভালো লাগল। প্রতিদিনের প্রাণলীলার অজস্র প্রতিরূপ, অথচ তার মধ্যে ইতর, অশোভন বা অশ্লীল কিছু মাত্র নেই।'



এরই সঙ্গে তিনি লিখেছেন;

'জাতককথায় অসংখ্য সামান্যের মধ্যে দিয়েই চরম অসামান্যকে স্বীকার করেছে। এতেই সামান্য এত বড় হয়ে উঠল। সেই জন্যই এত বড় মন্দিরের ভিত্তির গায়ে গায়ে তুচ্ছ জীবনের বিবরণ এমন সরল ও নির্মল শ্রদ্ধার সঙ্গে চিত্রিত। ধর্মেরই প্রকাশ-চেষ্টার আলোতে সমস্ত প্রাণীর ইতিহাস বৌদ্ধধর্মের প্রভাবে মহিমান্বিত।'

বৌদ্ধধর্মের প্রতি রবীন্দ্রনাথের গভীর শ্রদ্ধা এবং বোরোবুদুরের বৌদ্ধ মন্দিরটি দর্শনকালে তাঁর মনে যে উদ্বেল ভাব জন্ম নেয়, তার প্রকাশ ঘটে তাঁর 'বোরোবুদুর' কবিতায়;

বোরোবুদুর
চিত্ত আজি শান্তিহীন লোভের বিকারে,
হৃদয় নীরস অহংকারে।
ক্ষিপ্রগতি বাসনার তাড়নায় তৃপ্তিহীন ত্বরা,
কম্পমান ধরা।
বেগ শুধু বেড়ে চলে ঊর্ধ্বশ্বাসে মৃগয়া-উদ্দেশে;
লক্ষ্য ছোটে পথে পথে, কোথাও পৌঁছে না পরিশেষে।
অন্তহারা সঞ্চয়ের আহুতি মাগিয়া
সর্বগ্রাসী ক্ষুধানল উঠেছে জাগিয়া।
তাই আসিয়াছে দিন,
পীড়িত মানুষ মুক্তিহীন,
আবার তাহারে
আসিতে হবে যে তীর্থদ্বারে
শুনিবারে;
পাষাণের মৌনতটে যে বাণী রয়েছে চিরস্থির,
কোলাহল ভেদ করি শত শতাব্দীর
আকাশে উঠিছে অবিরাম
অমেয় প্রেমের মন্ত্র;
'বুদ্ধের শরণ লইলাম।'
বোরোবুদুর, যবদ্বীপ
২৩ সেপ্টেম্বর ১৯২৭

বোরোবুদুরের গেটের কাছে কতকগুলি স্যুভেনিরের দোকান আছে। সেখান থেকে কিছু হস্তশিল্প কিনলাম। তার মধ্যে রাম-সীতার মুখোশটি বেশ আকর্ষণীয়।

প্রামবানানের পথে

বোরোবুদুর থেকে প্রামবানান যেতে এক ঘণ্টা বা তার কিছু বেশি সময় লাগে। বোরোবুদুর দেখে আমরা প্রামবানানের পথে রওনা দিলাম। ঠিক হলো, রাস্তায় কোথাও দুপুরে খেয়ে নেব।

বোরোবুদুর ছাড়িয়ে খানিক এগোতেই পথে পড়ল একটি ছোট্ট মন্দির। নাম চাণ্ডী পাওন। এটি একটি বৌদ্ধমন্দির। শৈলেন্দ্র রাজবংশের সময়, অষ্টম থেকে নবম শতাব্দীর মধ্যে, এটি নির্মিত হয়। মন্দিরে ঢোকার মুখে দরজার দু'পাশে দ্বারপাল বা কুবেরের মূর্তি নির্মিত আছে। মন্দিরটির ছাদ বিশেষ বৈশিষ্ট্যযুক্ত। কয়েকটি স্তূপের মাঝখানে একটি বড় স্তূপ; এটি বৌদ্ধ মন্দিরের একটি বৈশিষ্ট্য।

পথে আমাদের চালক এক জায়গায় গাড়ি দাঁড় করিয়ে বলল, এখানেই তোমাদের খাবারের ব্যবস্থা। খাবারের ঘরটির ছাদে বৌদ্ধ স্থাপত্যের ছাপ রয়েছে। রেস্তোরাঁয় প্রবেশ করা মাত্র আমাদের গরম জলে ভেজানো একটি ছোট তোয়ালে দেওয়া হলো হাত-মুখ পরিষ্কার করে নেওয়ার জন্য। ব্যবহারের পর তোয়ালেটি রাখার জন্যও একটি ব্যবস্থা আছে।

তোয়ালে দিয়ে মুখ মুছে আমরা রেস্তোরাঁর অভ্যন্তরে প্রবেশ করলাম। রেস্তোরাঁটির মাথায় ছাদ, এ ছাড়া তিন দিক উন্মুক্ত। খাবারের জায়গাটি শিল্পসুষমামণ্ডিত। এখানকার সমস্ত রেস্তোরাঁই পরিবেশের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে সজ্জিত।

আমরা চিকেন এবং সবজি-সিদ্ধসহকারে দুপুরের খাবার খেলাম। আমাদের গাইড এবং চালককে খাবারের জন্য বলা সত্ত্বেও তাঁরা আমাদের সঙ্গে খেতে রাজি হলেন না। তাঁদের হয়তো অন্য কোনো ব্যবস্থা আছে।

খাবার অত্যন্ত সুস্বাদু। তৃপ্তি ভরে খেয়ে আমরা প্রামবানানের পথে রওনা দিলাম। (ক্রমশ)

দেশের খবর

ভোটার তালিকায় নজিরবিহীন অনিশ্চয়তা : Form 7– Adjudication এবং নির্বাচন কমিশনের দায়বদ্ধতা

পার্থ প্রতিম বিশ্বাস

ভারতের গণতন্ত্রের সবচেয়ে বড় শক্তি হল জনগণের ভোটাধিকার। সংবিধান প্রত্যেক যোগ্য নাগরিককে ভোট দেওয়ার অধিকার দিয়েছে। সেই অধিকার প্রয়োগের প্রথম শর্ত হল ভোটার তালিকায় নিজের নাম থাকা। অথচ পশ্চিমবঙ্গে Special Intensive Revision (SIR) বা বিশেষ নিবিড় ভোটার তালিকা সংশোধন প্রক্রিয়া এবং তার পরবর্তী ঘটনাবলি সাধারণ মানুষের কাছে এক গভীর অনিশ্চয়তার জন্ম দিয়েছে। ভোটার তালিকা সংশোধনের নামে যে প্রশাসনিক প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল, তা এখন লক্ষ লক্ষ মানুষের নাগরিক অধিকার, গণতান্ত্রিক অংশগ্রহণ এবং রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ নিয়ে প্রশ্ন তুলে দিয়েছে।

নির্বাচন কমিশনের বক্তব্য, ভোটার তালিকাকে নির্ভুল ও স্বচ্ছ করাই SIR-এর উদ্দেশ্য। মৃত, স্থানান্তরিত, একাধিক জায়গায় নাম থাকা কিংবা অযোগ্য ব্যক্তিদের নাম বাদ দেওয়া অবশ্যই প্রয়োজন। কিন্তু সেই কাজ করতে গিয়ে একজন প্রকৃত ও যোগ্য ভোটারের নাম যাতে কোনওভাবেই বাদ না পড়ে, সেটাও সমান গুরুত্বপূর্ণ। কারণ মৃত ব্যক্তির নাম বাদ দেওয়ার প্রশাসনিক প্রয়োজনীয়তা এবং জীবিত, স্থায়ী বাসিন্দা ও যোগ্য নাগরিকের ভোটাধিকার কেড়ে নেওয়া; দুটি সম্পূর্ণ ভিন্ন বিষয়।

ফর্ম ৭ নাম বাদ দেওয়ার প্রক্রিয়া নিয়ে গুরুতর প্রশ্ন

পশ্চিমবঙ্গে SIR-পর্বে ফর্ম-৭-এর ব্যবহার নিয়ে একাধিক অভিযোগ ও বিতর্ক সামনে এসেছে। ফর্ম-৭ হল কোনও বিদ্যমান ভোটারের নাম বাদ দেওয়ার জন্য আপত্তি জানানোর নির্দিষ্ট আবেদনপত্র। কিন্তু এই ফর্মের অপব্যবহার করে কোনও রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে বা ব্যক্তিগত আক্রোশে প্রকৃত ভোটারের নাম বাদ দেওয়ার চেষ্টা হলে তা গণতন্ত্রের পক্ষে অত্যন্ত বিপজ্জনক। অথচ তাই হয়েছে।

নির্বাচন কমিশনের নিজস্ব তথ্য অনুযায়ী, ২০২৬ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারি প্রকাশিত চূড়ান্ত ভোটার তালিকার পরিসংখ্যানে চদ্রন্দ্ব ৭-এর মাধ্যমে মোট ৫ লক্ষ ৪৬ হাজার ৫৩ জনের নাম বাদ দেওয়ার তথ্য রয়েছে। প্রশ্ন হল, এই বিপুল সংখ্যক নাম বাদ দেওয়ার ক্ষেত্রে

প্রত্যেকটি অভিযোগ কতটা নিরপেক্ষভাবে যাচাই করা হয়েছে? সংশ্লিষ্ট ভোটারকে যথাযথভাবে জানানো হয়েছিল কি? তাঁর বক্তব্য শোনার সুযোগ দেওয়া হয়েছিল কি?

Registration of Electors Rules, ১৯৬০-এর বিধি ১৯ ও ২০ এবং বিধি ২১এ-তে নাম বাদ দেওয়ার ক্ষেত্রে নোটিশ, শুনানি এবং যুক্তিসংগত সুযোগ দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। অর্থাৎ ফর্ম-৭ জমা পড়লেই কোনও ভোটারের নাম স্বয়ংক্রিয়ভাবে বাদ দেওয়ার কথা নয়। অভিযোগের সত্যতা যাচাই এবং আইনসম্মত প্রক্রিয়া অনুসরণ করা বাধ্যতামূলক। সুতরাং ফর্ম-৭-এর মাধ্যমে যাঁদের নাম বাদ গিয়েছে, তাঁদের প্রত্যেকের ক্ষেত্রে কী অভিযোগ উঠেছিল, কী তদন্ত হয়েছে এবং কী সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, তার পূর্ণাঙ্গ তথ্য প্রকাশ করা নির্বাচন কমিশনের দায়িত্ব।

Adjudication- লক্ষ লক্ষ মানুষের ভবিষ্যৎ এখনও অনিশ্চিত

SIR-এর সবচেয়ে উদ্বেগজনক দিক হল Adjudication- বা বিচারাধীন তালিকা। পশ্চিমবঙ্গের চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশের সময় নির্বাচন কমিশনের প্রকাশিত পরিসংখ্যানে ৬০ লক্ষ ৬ হাজার ৬৭৫ জন ভোটারের নাম বিচারাধীন হিসেবে চিহ্নিত ছিল। তাঁদের ভবিষ্যৎ নির্ধারণের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল বিচারবিভাগীয় আধিকারিকদের।

পরবর্তী সময়ে বিচারবিভাগীয় সিদ্ধান্তের মাধ্যমে বহু নাম অন্তর্ভুক্ত ও বাদ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এখানেই সমস্যার শেষ হয়নি। যাঁদের নাম বাদ গিয়েছে, তাঁদের মধ্যে বিপুল সংখ্যক মানুষ আপিল করেছেন। আবার অন্তর্ভুক্তির বিরুদ্ধেও ১৬ লক্ষ আপিল হয়েছে। প্রাথমিক ভাবে জানা গিয়েছিল এই ১৬ লক্ষ নাম বাদ দেওয়ার আবেদন করেছে স্বয়ং ভারতের ইলেকশন কমিশন। এখন জ্ঞানেশকুমার বলছেন তারা এই আবেদন করেন নি। তৎকালীন রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক মনোজ আগরওয়াল বলেছেন তারা এই বিষয়ে কিছু জানেন না। তারা এই নাম বাদ দেওয়ার আবেদন করেননি। এই বিষয়ে একই কথা বলেছেন স্পেশাল রোল অবজার্ভার সুব্রত গুপ্ত মহাশয়।

১৮ সেপ্টেম্বর ২০২৬-এ নির্বাচন কমিশন সুপ্রিম কোর্টকে জানিয়েছিল, SIR-সংক্রান্ত নাম অন্তর্ভুক্তি ও বাদ দেওয়ার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে মোট ৩৮ লক্ষ ২০ হাজার ৬৮৩টি আপিল জমা পড়েছিল। তার মধ্যে মাত্র ১ লক্ষ ২ হাজার ২৩১টি নিষ্পত্তি হয়েছিল। অর্থাৎ ৩৭ লক্ষেরও বেশি আবেদন তখনও বিচারাধীন ছিল।

এই পরিসংখ্যানই প্রমাণ করে যে পশ্চিমবঙ্গের ভোটার তালিকা নিয়ে সমস্যা কতটা গভীর।

সবচেয়ে বড় প্রশ্ন হল, যাঁদের নাম বিচারাধীন রয়েছে কিংবা যাঁদের নাম বাদ দেওয়ার বিরুদ্ধে আপিল চলছে, তাঁদের ভোটাধিকার কীভাবে নিশ্চিত করা হবে? তাঁদের আবেদন নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত তাঁরা কি অনিশ্চয়তার মধ্যেই থাকবেন?

নতুন করে ফর্ম- ৬ জমা দেওয়ার নির্দেশ কি সমস্যার সমাধান?

নির্বাচন কমিশন ১ অক্টোবর ২০২৬-এ SIR-পরবর্তী বিশেষ উদ্যোগের নির্দেশ দিয়েছে। এই নির্দেশে বলা হয়েছে, ঋজ্রঞ্জ-রা পুরনো ও বর্তমান ভোটার তালিকা মিলিয়ে যাঁদের নাম আগে ছিল কিন্তু বর্তমানে নেই, তাঁদের চিহ্নিত করবেন। বাড়ি বাড়ি গিয়ে তাঁদের বর্তমান অবস্থা যাচাই করবেন এবং যোগ্য হলে চ্দ্রন্দ্ব ৬-এর মাধ্যমে নতুন করে নাম অন্তর্ভুক্তির ব্যবস্থা করবেন।

এটি নিঃসন্দেহে একটি প্রয়োজনীয় উদ্যোগ। কিন্তু এই নির্দেশের বাস্তব প্রয়োগ নিয়ে পশ্চিমবঙ্গে নতুন করে বিভ্রান্তি তৈরি হয়েছে।

কারণ যাঁদের নাম SIR-এর সময় বাদ গিয়েছে এবং যাঁদের আবেদন ইতিমধ্যেই বিচারবিভাগীয় ট্রাইব্যুনালে বিচারাধীন, তাঁদের ক্ষেত্রে নতুন করে চ্দ্রন্দ্ব ৬ জমা দেওয়ার সুযোগ নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। ৭ অক্টোবর ২০২৬-এ পশ্চিমবঙ্গের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দপ্তরের বক্তব্য উদ্ধৃত করে সংবাদমাধ্যমে জানানো হয়, বিচারবিভাগীয় আধিকারিকদের সিদ্ধান্ত বা ট্রাইব্যুনালে বিচারাধীন আপিলের বিষয়ে ERO কিংবা DEO প্রশাসনিকভাবে সিদ্ধান্ত নিতে পারবেন না। ফলে ট্রাইব্যুনালে যাঁদের মামলা বিচারাধীন, তাঁদের ক্ষেত্রে ফর্ম-৬ জমা দিয়ে সমস্যার সমাধান হচ্ছে না।

অর্থাৎ একদিকে কমিশন নতুন করে ভোটার তালিকায় নাম তোলার উদ্যোগ নিচ্ছে, অন্যদিকে যাঁরা আগের ভোটার তালিকায় ছিলেন অথচ SIR -এর কারণে নাম হারিয়েছেন, তাঁদের একটি বড় অংশের জন্য কার্যকর ও দ্রুত সমাধানের পথ এখনও অস্পষ্ট।

নতুন SSR প্রক্রিয়া পুরনো সমস্যার সমাধান হবে তো?

এরই মধ্যে নির্বাচন কমিশন ১৫ অক্টোবর ২০২৬-এ পশ্চিমবঙ্গ-সহ একাধিক রাজ্যে Special Summary Revision বা SSR-এর নির্দেশ জারি করেছে। ২০২৭ সালের ১ জানুয়ারিকে যোগ্যতার নির্ধারিত তারিখ ধরে এই সংশোধন প্রক্রিয়া পরিচালিত হচ্ছে।

নির্দেশ অনুযায়ী, ১২ নভেম্বর ২০২৬-এ সমন্বিত খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশের কথা এবং ১২ নভেম্বর থেকে ১১ ডিসেম্বর পর্যন্ত

দাবি ও আপত্তি জানানোর সময় নির্ধারণ করা হয়েছে। চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশের নির্ধারিত তারিখ ৪ জানুয়ারি ২০২৭।

এখানেই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন উঠছে। নতুন SSRএর মাধ্যমে যাঁরা প্রথমবার ভোটার হবেন কিংবা যাঁদের নাম কোনও কারণে বাদ পড়েছে, তাঁদের নাম অন্তর্ভুক্তির সুযোগ তৈরি হবে। কিন্তু যাঁদের নাম বিচারবিভাগীয় প্রক্রিয়ায় বাদ গিয়েছে অথবা যাঁদের আপিল এখনও নিষ্পত্তি হয়নি, তাঁদের সমস্যার সমাধান কীভাবে হবে?

নতুন করে নাম তোলার সাধারণ প্রক্রিয়া এবং পূর্ববর্তী ভোটার তালিকা থেকে অন্যায়ভাবে বাদ পড়া কোনও নাগরিকের অধিকার পুনরুদ্ধার; দুটি বিষয়কে এক করে দেখা যায় না।

নির্বাচন কমিশনের কাছে কয়েকটি জরুরি প্রশ্ন ;

পশ্চিমবঙ্গের মানুষের স্বার্থে নির্বাচন কমিশনকে কয়েকটি বিষয়ে অবিলম্বে স্পষ্ট অবস্থান জানাতে হবে।

প্রথমত, ফর্ম-৭-এর মাধ্যমে যাঁদের নাম বাদ দেওয়া হয়েছে, তাঁদের প্রত্যেকের ক্ষেত্রে কী ধরনের যাচাই হয়েছে, তার পূর্ণাঙ্গ তথ্য প্রকাশ করতে হবে।

দ্বিতীয়ত, Adjudication-এ থাকা এবং পরবর্তী বিচারবিভাগীয় প্রক্রিয়ায় নাম বাদ যাওয়া ভোটারদের বিষয়ে নির্দিষ্ট সময়সীমা ঘোষণা করতে হবে।

তৃতীয়ত, যাঁদের নাম আগে ভোটার তালিকায় ছিল এবং যাঁরা বৈধভাবে ভোট দিয়েছেন, তাঁদের নাম বাদ যাওয়ার পর পুনরায় অন্তর্ভুক্তির জন্য সহজ, স্বচ্ছ ও কার্যকর ব্যবস্থা করতে হবে।

চতুর্থত, নতুন SSR-এর সঙ্গে পূর্ববর্তী SIR-এ বাদ পড়া ভোটারদের সমস্যার সমাধানকে যুক্ত করতে হবে। শুধু নতুন ভোটারদের নাম তোলার ব্যবস্থা করলেই পুরনো ভোটারদের সমস্যার সমাধান হবে না।

পঞ্চমত, প্রতিটি বিধানসভা কেন্দ্র এবং বুথভিত্তিক সংযোজন, বিয়োজন, Adjudication ও আপিলের নিষ্পত্তির বিস্তারিত পরিসংখ্যান প্রকাশ করতে হবে। রাজনৈতিক দলগুলিকেও সেই তথ্য সরবরাহ করতে হবে, যাতে প্রকৃত পরিস্থিতি যাচাই করা সম্ভব হয়।

ভোটাধিকার কোনও প্রশাসনিক দয়া নয়, এটি সাংবিধানিক অধিকার।

মনে রাখতে হবে, ভোটার তালিকা সংশোধন নির্বাচন কমিশনের সাংবিধানিক দায়িত্ব। কিন্তু সেই দায়িত্ব পালনের নামে কোনও যোগ্য নাগরিক যেন তাঁর ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত না হন, তা নিশ্চিত করাও কমিশনের সমান গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব।

একজন নাগরিকের নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ পড়া মানে শুধু একটি নাম বাদ যাওয়া নয়। এর অর্থ, তিনি দেশের গণতান্ত্রিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়তে পারেন। বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গের মতো একটি রাজনৈতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ রাজ্যে লক্ষ লক্ষ মানুষের ভোটাধিকার নিয়ে অনিশ্চয়তা তৈরি হওয়া কোনওভাবেই স্বাভাবিক ঘটনা হতে পারে না।

নির্বাচন কমিশনকে মনে রাখতে হবে, নির্ভুল ভোটার তালিকা তৈরির উদ্দেশ্য শুধু অযোগ্য ভোটারদের বাদ দেওয়া নয়, প্রত্যেক যোগ্য নাগরিকের নাম তালিকায় নিশ্চিত করাও। এই দুটি দায়িত্বের মধ্যে ভারসাম্য নষ্ট হলে গণতন্ত্রের ভিত্তিই দুর্বল হয়ে পড়ে।

পশ্চিমবঙ্গের মানুষ আজ জানতে চান, তাঁদের ভোটাধিকার নিয়ে এই অনিশ্চয়তার অবসান কবে হবে? যাঁদের নাম অন্যায়ভাবে বাদ পড়েছে, তাঁরা কবে তাঁদের অধিকার ফিরে পাবেন? যাঁরা এখনও Adjudication বা আপিলের অপেক্ষায় রয়েছেন, তাঁদের ভবিষ্যৎ কী?

নির্বাচন কমিশনের কাছে এই প্রশ্নগুলির স্পষ্ট উত্তর চাই। কারণ ভোটার তালিকা কোনও রাজনৈতিক দলের সম্পত্তি নয়, এটি গণতন্ত্রের ভিত্তি। আর ভোটাধিকার কোনও সরকারের বা নির্বাচন কমিশনের অনুগ্রহ নয়; এটি একজন যোগ্য নাগরিকের সাংবিধানিক অধিকার।

গণতন্ত্রকে শক্তিশালী করতে হলে প্রত্যেক যোগ্য ভোটারের নাম ভোটার তালিকায় থাকতে হবে। একজনও প্রকৃত ভোটার যেন বাদ না পড়েন; এটাই হওয়া উচিত নির্বাচন কমিশনের সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার।

গণতন্ত্র ও অহিংসার রাজনীতি নিয়ে হায়দ্রাবাদে সরব রাহুল

তেলেঙ্গানার হায়দ্রাবাদে ১৩ ও ১৪ নভেম্বর কংগ্রেস ও রাজ্য সরকারের যৌথ উদ্যোগে দু'দিনব্যাপী আন্তর্জাতিক সম্মেলন 'ভারত সামিট ২০২৬' অনুষ্ঠিত হয়। ভারতের স্বাধীনতার ৮০ বছর এবং জওহরলাল নেহরুর ১৩৭তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত এই সম্মেলনের সমাপ্তি অধিবেশনে (Delivering Global Justice) লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী দেশের গণতন্ত্র, নির্বাচন প্রক্রিয়া এবং অহিংসা ও সত্যের রাজনীতি নিয়ে বক্তব্য রাখেন।

মুখ্যমন্ত্রী এ. রেবন্ত রেড্ডির নেতৃত্বাধীন রাজ্য সরকারের সহযোগিতায় আয়োজিত এই সম্মেলনে ৭০টি দেশের নীতিনির্ধারক, রাজনীতিবিদ ও চিন্তাবিদ অংশ নেন। নেদারল্যান্ডসের প্রাক্তন বিদেশমন্ত্রী বার্ট কোয়েন্ডার্স, দক্ষিণ কোরিয়ার প্রাক্তন বিদেশমন্ত্রী চুং ইউই-ইয়ং এবং ব্রাজিলের ওয়ার্কার্স পার্টির সভাপতি এদিনহো সিলভা ছিলেন উপস্থিতদের মধ্যে। তেলেঙ্গানা কংগ্রেসের সাংসদ ও মুখপাত্র চামালা কিরণ কুমার রেড্ডির মতে, আফ্রো-এশীয় সংহতি ও জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনের ঐতিহ্য পুনরুজ্জীবিত করাই সম্মেলনের লক্ষ্য।

সমাপ্তি ভাষণে রাহুল অভিযোগ করেন, ২০১৪ সালে ভারতে গণতন্ত্র ধ্বংস করা হয়েছে এবং দেশ এখন আর গণতান্ত্রিক নেই। ভারতীয় গণতন্ত্রকে 'বৈশ্বিক ঐতিহ্য' আখ্যা দিয়ে তা রক্ষার ওপর জোর দেন তিনি এবং নির্বাচন প্রক্রিয়া ও সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানগুলোর বর্তমান অবস্থা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন। তাঁর অভিযোগ, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতা মুষ্টিমেয় কিছু শিল্পপতির হাতে কেন্দ্রীভূত হওয়ায় সাধারণ মানুষের কণ্ঠরোধ হচ্ছে।

মহাত্মা গান্ধীর আদর্শের কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, কংগ্রেসের লড়াই কেবল বর্তমানের জন্য নয়, অতীত ও ভবিষ্যতের জন্যও। 'ভারত জোড়ো যাত্রা'র অভিজ্ঞতা থেকে তাঁরা শিখেছেন, মিথ্যা, রাগ, ঘৃণা, সহিংসতা বা ভয় কাজ করে না; ভালোবাসা, সত্য ও অহিংসাই সবচেয়ে শক্তিশালী রাজনৈতিক অস্ত্র। বিশ্বজুড়ে এক ক্ষুদ্র গোষ্ঠী নিজেদের ঈশ্বর মনে করে বলে মন্তব্য করে তাদের 'ফ্যাসিস্ট' আখ্যা দেন রাহুল এবং সমমনস্ক শক্তিগুলোকে ঐক্যবদ্ধভাবে তাদের পরাজিত করার আহ্বান জানান।

বেশ কয়েকজন বিদেশি প্রতিনিধিকে ভারত সরকার দেশে প্রবেশের অনুমতি দেয়নি বলে অভিযোগ করে রাহুল তাঁদের কাছে ক্ষমা চান। তাঁর বক্তব্য, এর মাধ্যমেই আন্তর্জাতিক প্রতিনিধিরা বুঝতে পারবেন দেশে তাঁদের কী ধরনের পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে হচ্ছে। কাশ্মীরে সাম্প্রতিক সন্ত্রাসী হামলায় জনসাধারণের প্রতি সংহতি জানানোর জন্য বিদেশি প্রতিনিধিদের ধন্যবাদ জানান তিনি। আহতদের সঙ্গে দেখা করতে কাশ্মীরে যাওয়ায় সম্মেলনের প্রথম দিনে উপস্থিত থাকতে না পারার জন্য দুঃখও প্রকাশ করেন।

সম্মেলনের পাশাপাশি রাহুল তেলেঙ্গানার গিগ ও প্ল্যাটফর্ম কর্মীদের জন্য বিশেষ বিধিমালা প্রকাশ করেন। রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে এই কর্মীদের জন্য ৫ লক্ষ টাকার জীবন বিমা ও ১০ লক্ষ টাকার স্বাস্থ্য বিমার ঘোষণা করেন তিনি।

নেহা বোরা ও পিস বন্ড স্বাক্ষর

নাগরিক প্রতিবেদন : ২০২৩ সালে লোকসভায় পাশ হওয়া ভারতীয় ন্যায় সংহিতা দাবি করে , এটা ব্রিটিশ উত্তরাধিকারে পাওয়া ইন্ডিয়ান পেনাল কোড পাল্টে স্বদেশী আইন চালু হল ! কিন্তু, নেহা বোরা প্রথম তুলে ধরে BNS এর ১২৫ অন্তর্গত Peace Bond (শান্তি রক্ষার চুক্তি) তাকে দিয়ে সই করাবার ৪ বার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয় দিল্লী পুলিশ। নেহা বোরাই প্রশ্ন তুলে দিলেন, ব্রিটিশ যুগের এই আইন কেন আজও ভারতে চলবে?

এই আইন নাগরিকদের শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদের (Sectio 21 of Constitution)মৌলিক অধিকার হরণ করে।

ঊনবিংশ শতকে বৃটিশ তার উপনিবেশগুলিতে প্রতিবাদীদের জন্য এই আইন ব্যবহার করত। পরবর্তীকালে বহু দেশ এই আইন বাতিল করে।

ভারতের প্রখ্যাত স্বাধীনতা সংগ্রামীদের এই চুক্তি স্বাক্ষর করানোর চেষ্টা চলত।

নেহা শুধু স্বাক্ষর করেন নি তা নয়, একটা ঔপনিবেশিক আইন বাতিলের দাবি তুলে এসেছেন। বিজেপির স্বদেশী আইনের নেপথ্যে কুখ্যাত বৃটিশ আইনের নির্লজ্জ ওকালতি ফাঁস করেছেন, যা ভারতবাসীর ন্যায্য গণতান্ত্রিক ও মৌলিক অধিকারকে সুনিশ্চিত করবে। গোটা দেশ এই দাবিতেই সোচ্চার।

অরুণাচলে চলমান বাঁধ বিরোধী আন্দোলন

পি এস মুখার্জি

অরুণাচলের বাঁধ বিরোধী আন্দোলন নিয়ে দু'ঘন্টা ধরে চলা একটি অনলাইন আলোচনা সভায় গতকাল ৩ নভেম্বর যোগ দিয়েছিলাম।

সেখানে অন্যান্য অরুণাচলবাসী ছাড়াও অরুণাচল কৃষক সমিতির দু'জন প্রতিনিধি হাজির ছিলেন। এই দুজন প্রতিনিধি বাঁধ বিরোধী আন্দোলনের মুখপাত্র হিসেবে ওই আলোচনা সভায় যোগ দেন। ওই দু'জনের বক্তব্য শুনে আমি স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। এত পরিষ্কার, এত তথ্যনির্ভর, নিজের জন্মভূমির প্রতি, প্রকৃতির অধিকারের প্রতি

নিবেদিত প্রাণ দুই কৃষক প্রতিনিধি যা বললেন তাতে বিস্ময়ের সীমা ছিল না! নিজেকে এত ক্ষুদ্র মনে হচ্ছিল সেই বক্তব্যের সামনে যে অনুভব করছিলাম এতকাল ধরে আমরা শুধুমাত্র একটা ছোট্ট বৃত্তের মধ্যে ঘুরপাক খেলাম! সেই বৃত্তের বাইরে যে বিশাল প্রান্তিক জনগোষ্ঠী আছে তাঁদের চিনলাম না, বুঝলাম না, তাঁদের সঙ্গে কথপোকথন গড়ে তুললাম না, অথচ প্রাণ চাঞ্চল্যে ভরপুর, উদার প্রকৃতির মত নির্মল এক জনগোষ্ঠী তাদের জীবন বাজী রেখে নিজেদের মাটি বাঁচাতে চাইছে; সে খবর আমরা কতজন রাখছি ? অংশগ্রহণকারী ওই ভূমিপুত্রদের একজনের বক্তব্যের সামান্য অংশ (যা নদী কর্মী তাপস দাস আমাকে পাঠালেন) সেটা এখানে রাখলাম।

"According to the ADI indigenous community"
the Siang river is Aane Siang (আনে অর্থ মা).
The Siang is my Mother– Siang is my Identity–
the Siang means the Adi–(আদি অর্থ the Siang.V
Tagori Mize (সমাজ কর্মী , সিয়াং উপত্যকা)

এই রকম আবেগ নিয়ে আমাদের বাংলা দিয়ে বহমান কোন নদী সম্পর্কে আমরা আজও অবধি বলতে পেরেছি কি ?

রাজ্য সংবাদ

প্রিয়রঞ্জন দাশমুন্সির মূর্তি আবরণ উন্মোচন : রাজনৈতিক সৌজন্য, সম্প্রীতি ও বহুত্ববাদের এক বিরল দৃষ্টান্ত

শুভাশিস মজুমদার

---

১৩ নভেম্বর ২০২৬, শুক্রবার। কলকাতার ঐতিহাসিক বিবাদী বাগ অঞ্চলে, রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সামনে প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী, বিশিষ্ট কংগ্রেস নেতা এবং ভারতীয় রাজনীতির এক উজ্জ্বল ব্যক্তিত্ব প্রিয়রঞ্জন দাশমুন্সির পূর্ণাবয়ব মূর্তি উন্মোচন অনুষ্ঠান এক বিরল রাজনৈতিক সম্প্রীতির সাক্ষী হয়ে রইল। গণ সংস্কৃতি সংসদের উদ্যোগে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দের সমবেত উপস্থিতি প্রমাণ করল, রাজনৈতিক মতাদর্শের বিভেদ থাকলেও শ্রদ্ধা, সৌজন্য ও ব্যক্তিগত সম্পর্কের বন্ধন অটুট থাকতে পারে। অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন রাজ্যপাল তথা ইলাহাবাদ হাইকোর্টের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি জাস্টিস শ্যামল কুমার সেন।

এই অনুষ্ঠানের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য দিক ছিল কংগ্রেস, তৃণমূল কংগ্রেস এবং সিপিএমের প্রথম সারির নেতাদের একই মঞ্চে উপস্থিতি। উপস্থিত ছিলেন বামফ্রন্টের চেয়ারম্যান বিমান বসু, সিপিএম নেতা সুজন চক্রবর্তী, প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শুভঙ্কর সরকার, প্রবীণ কংগ্রেস নেতা প্রদীপ ভট্টাচার্য ও আব্দুল মান্নান। তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষে উপস্থিত ছিলেন শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়, কুণাল ঘোষ ও মদন মিত্র। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন সাংসদ প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়-সহ বিশিষ্ট রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বরা।

প্রত্যেকের বক্তব্যেই উঠে আসে প্রিয়রঞ্জন দাশমুন্সির রাজনৈতিক প্রজ্ঞা, সাংগঠনিক দক্ষতা, উদার মানসিকতা এবং সর্বজনগ্রাহ্য ব্যক্তিত্বের কথা। শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় তাঁর ছাত্রজীবনের স্মৃতিচারণা করে বলেন, প্রিয়রঞ্জনই তাঁকে ছাত্র রাজনীতিতে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সুযোগ করে দিয়েছিলেন।

বামফ্রন্ট চেয়ারম্যান বিমান বসু প্রিয়রঞ্জনের সঙ্গে তাঁর দীর্ঘদিনের সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্কের স্মৃতি তুলে ধরেন। তাঁর বক্তব্যে স্পষ্ট হয়ে ওঠে, রাজনৈতিক মতপার্থক্য কখনও ব্যক্তিগত সম্পর্কের অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়নি। সুজন চক্রবর্তীও প্রিয়রঞ্জনকে বহুত্ববাদী রাজনৈতিক সংস্কৃতির এক উজ্জ্বল প্রতিনিধি হিসেবে অভিহিত করেন।

মদন মিত্র আবেগঘন কণ্ঠে জানান, রাজনৈতিক জীবনের সূচনালগ্নে প্রিয়রঞ্জন দাশমুন্সির অবদান তিনি কখনও ভুলতে পারবেন না। অন্যদিকে, কুণাল ঘোষ তাঁর বক্তব্যে বিজেপির বিরুদ্ধে বৃহত্তর বিরোধী ঐক্যের প্রয়োজনীয়তার কথা তুলে ধরেন। তবে, গণ সংস্কৃতি সংসদের সভাপতি তথা কংগ্রেস নেতা অমিতাভ চক্রবর্তী স্পষ্ট করেন, এই অনুষ্ঠান মূলত প্রিয়রঞ্জনের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের মঞ্চ, রাজনৈতিক জোটের আলোচনা করার জায়গা নয়।

এই অনুষ্ঠানে প্রিয়রঞ্জনের স্মরণে 'প্রিয়-ভাষ' নামে একটি স্মারক সংকলনও প্রকাশিত হয়।

সব মিলিয়ে, ১৩ নভেম্বরের এই অনুষ্ঠান নিছক একটি মূর্তি উন্মোচন কর্মসূচি ছিল না। এটি ছিল বাংলার রাজনৈতিক ইতিহাসের এক হারিয়ে যেতে বসা সংস্কৃতির পুনরুজ্জীবনের বার্তা। প্রিয়রঞ্জন দাশমুন্সি তাঁর রাজনৈতিক জীবনে যে সৌহার্দ্য, সহনশীলতা, উদারতা ও পারস্পরিক শ্রদ্ধার দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন, বিভিন্ন দলের নেতাদের এক মঞ্চে উপস্থিতি যেন তারই প্রতিফলন।

প্রিয়রঞ্জন দাশমুন্সির মূর্তি আজ শুধু একটি পাথরের অবয়ব নয়, বরং তা হয়ে উঠুক রাজনৈতিক সহিষ্ণুতা, গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ এবং মতাদর্শের ঊর্ধ্বে মানবিক সম্পর্কের এক চিরন্তন প্রতীক।

পুরুলিয়ায় বিশাল আদিবাসী সমাবেশ

অনিতেশ চক্রবর্তীর প্রতিবেদন : মানবাজারের পাথরকাটা মাঠে জড়ো হয়েছেন লক্ষাধিক আদিবাসী মানুষ। কেন? রেয়ার আর্থ উত্তোলনের বিরুদ্ধে, পুরুলিয়া জুড়ে দূষণ সৃষ্টিকারী কারখানা বন্ধের দাবিতে, খনি বা সোলারের নামে উচ্ছেদের বিরুদ্ধে, আদিবাসী মানুষদের বাস্তু-বন-পাহাড় পুঁজিপতিদের হাতে তুলে দেওয়ার বিরুদ্ধে, বনাধিকারের দাবিতে এবং পেসা লাগু করার ডাকে।

পরিবেশ-জনস্বাস্থ্যরক্ষার দাবি, কর্পোরেট আগ্রাসনের বিরোধিতা এবং জাতিসত্তাগত অধিকারের দাবি মিলেমিশে এমন বিরাট





জমায়েত এই রাজ্যে সাম্প্রতিককালে হয়েছে কি? সম্ভবত না। এবং মূলস্রোতের মিডিয়া কিন্তু চুপ। কারণ, প্রান্তের মানুষ কী বলছেন, তাতে খুব একটা কান দিলে চলে না। এবং আজকের সভা থেকে সরকারের স্তুতি গাওয়াও হচ্ছে না।

সভামাঠের চারপাশে ২-৩ কিমি অবধি ঠাসা ভিড়। হাজারে হাজারে মানুষ মাঠে ঢুকতে পারেননি। অযোধ্যা পাহাড় থেকে আসা গাড়িগুলোও মাঠের থেকে অনেক দূরে আটকে ছিলো।ভ

এ ঘোর দুঃসময়, অত্যন্ত সুসময়ও বটে। আমরা বইয়ের জন্য হাঁটলাম। সে হাঁটা জরুরিও ছিল। এবার একটু মানুষের প্রাণ, অধিকার, নিসর্গ, বন্যপ্রাণ ও ভূ-সম্পদ লুটের বিরুদ্ধেও গলা তুলি।

ছট পুজো কী?

জহর সরকার

ছট (ষষ্ঠী) পুজো নিয়ে অনেকেরই বেশ কৌতূহল। তাই বোঝার চেষ্টা করা যাক, এটা আসলে কী। এটি সূর্য-ষষ্ঠীর উৎসব, দীপাবলির ছ'দিন পরে পালিত হয়। কার্তিকী অমাবস্যার বছরের সবচেয়ে কালো রাতের পর আলো আর সূর্যের প্রথম উদযাপন এটিই।

মূলত এটি ছিল মেয়েদের উৎসব, সূর্যদেবকে কৃতজ্ঞতা জানানোর জন্য। পুরুষেরা যোগ দিয়েছেন অনেক পরে। ভক্তেরা ছটি মাইয়া ও সূর্যদেবের কাছে বর প্রার্থনা করেন। এই উৎসবের অনন্যতা হল, এখানে ভোর আর গোধূলি দুই বেলাতেই পুজো হয়। উদীয়মান সূর্য যেমন পূজিত হয়, অস্তগামী সূর্যও তেমনই।

বিহার-ঝাড়খণ্ড ও সংলগ্ন অঞ্চলে এবং নেপালের মধেশ এলাকায় এর জনপ্রিয়তা সবচেয়ে বেশি। বিহারিরা যেখানে গিয়েছেন, ফিজি, ওয়েস্ট ইন্ডিজ কিংবা মরিশাসে, উৎসবটিও সেখানে পৌঁছে গিয়েছে। অনেকে একে মানুষ ও ফসল, দুয়ের উর্বরতার আচার বলে মনে করেন। আবার কেউ কেউ এর রোগনিরাময়ের ক্ষমতায় প্রগাঢ় বিশ্বাসী।

লক্ষ লক্ষ বিহারি কেন গাড়ি বোঝাই বা মাথায় করে কলা, নারকেল, আখ আর নানা ফলের ঝুড়ি নিয়ে গঙ্গা বা অন্য নদী, কিংবা সমুদ্রের ধারে যান, তা নিয়ে অনেকে অবাক হন। আজকাল অবশ্য একদল পুরোহিত জলের ধারে সুবিধাজনক জায়গা দখল করে বসেন

এবং ভক্তদের কাছ থেকে দক্ষিণা নেন, কারণ অন্য কোনো রোজগারের পথ চোখে পড়ে না।

আগের দিন ভক্তেরা শুধু লাউ-ভাত খান, অর্থাৎ লাউ দিয়ে সেদ্ধ ভাত। চার দিনের আসল উৎসব শুরু হয় কার্তিকের অমাবস্যা, অর্থাৎ দীপাবলি বা কালীপুজোর পরের চতুর্থী তিথি থেকে। এ বছর চতুর্থী পেরিয়ে গিয়েছে, পঞ্চমী ২৯ অক্টোবর, মূল দিন ষষ্ঠী বা ছট ৩০ অক্টোবর, আর সপ্তমী ৩১ অক্টোবর। উপবাস বাধ্যতামূলক, তাই ব্রত



শুরুর আগে লোকে নতুন কাটা ধানের চাল, পুরি, কলা, নারকেল আর বাতাবিলেবু প্রচুর খেয়ে নেন।

প্রথম দিন 'নাহায় খায়' নামে পরিচিত। এদিন পবিত্র জলে স্নান করা হয়। যে মেয়েরা ব্রত পালন করেন, তাঁরা মাত্র একবার আহার করেন এবং হাঁটু বা কোমর জলে নেমে সূর্যের দিকে মুখ করে প্রার্থনা করেন। এর পর আসে এক প্রাচীন রীতি: বিবাহিত মেয়েরা একে অপরের কপালে নাকের রেখা বরাবর, ডগা পর্যন্ত গেরুয়া সিঁদুর লেপে দেন।

দ্বিতীয় দিন 'খরনা' এদিন সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত এক ফোঁটা জলও না খেয়ে নির্জলা উপবাস চলে। সূর্যাস্তের সময় আগে সূর্যদেবকে নিবেদন করে তবেই ভক্তেরা খান। সেই ভোজ বেশ সমৃদ্ধঃচাল ও দুধের পায়েস বা খীর, পুরি, ঠেকুয়া নামের শক্ত করে সেঁকা আটার পিঠে আর কলা, যা সবার মধ্যে বিতরণ করা হয়।

তৃতীয় দিন আসল 'ছট'। এদিনও নির্জলা উপবাস। সন্ধ্যার অর্ঘ্য বা সন্ধ্যা অর্ঘ্য একটি বিস্তারিত আচার, যাতে অস্তগামী সূর্যকে নৈবেদ্য দেওয়া হয়। বাঁশের ডালায় ভক্তদের প্রিয় ঠেকুয়া, নারকেল, কলা ও অন্যান্য ফল সাজিয়ে সূর্যের দিকে তুলে ধরা হয়।

চতুর্থ দিনও অত্যন্ত পবিত্র। পরিবার ও বন্ধুদের নিয়ে ভক্তেরা দলে দলে নদীর ঘাটে জড়ো হন উদীয়মান সূর্যকে প্রাতঃকালীন অর্ঘ্য দিতে, এটাই শেষ আচার। এরপর চিনি দিয়ে একটুকরো আদা খেয়ে উপবাস ভাঙা হয় এবং আচারের সমাপ্তি ঘটে। তখন আনন্দ, ভোজ আর উৎসবের জোয়ার বয়ে যায়।

ছট পুজো এমন একটি সময়, যখন সবচেয়ে রঙিন পোশাক বেরিয়ে আসে, আর থাকে প্রচুর লোকগান ও নাচ। অতীতে বিহারের নাম ছিল মগধ। কেউ কেউ অনুমান করেন, এই বিশেষ সূর্যপুজোয় (ছটে) মধ্যপ্রাচ্যের সূর্যের পুরোহিত মাগিদের কোনো ভূমিকা থাকতে পারে।

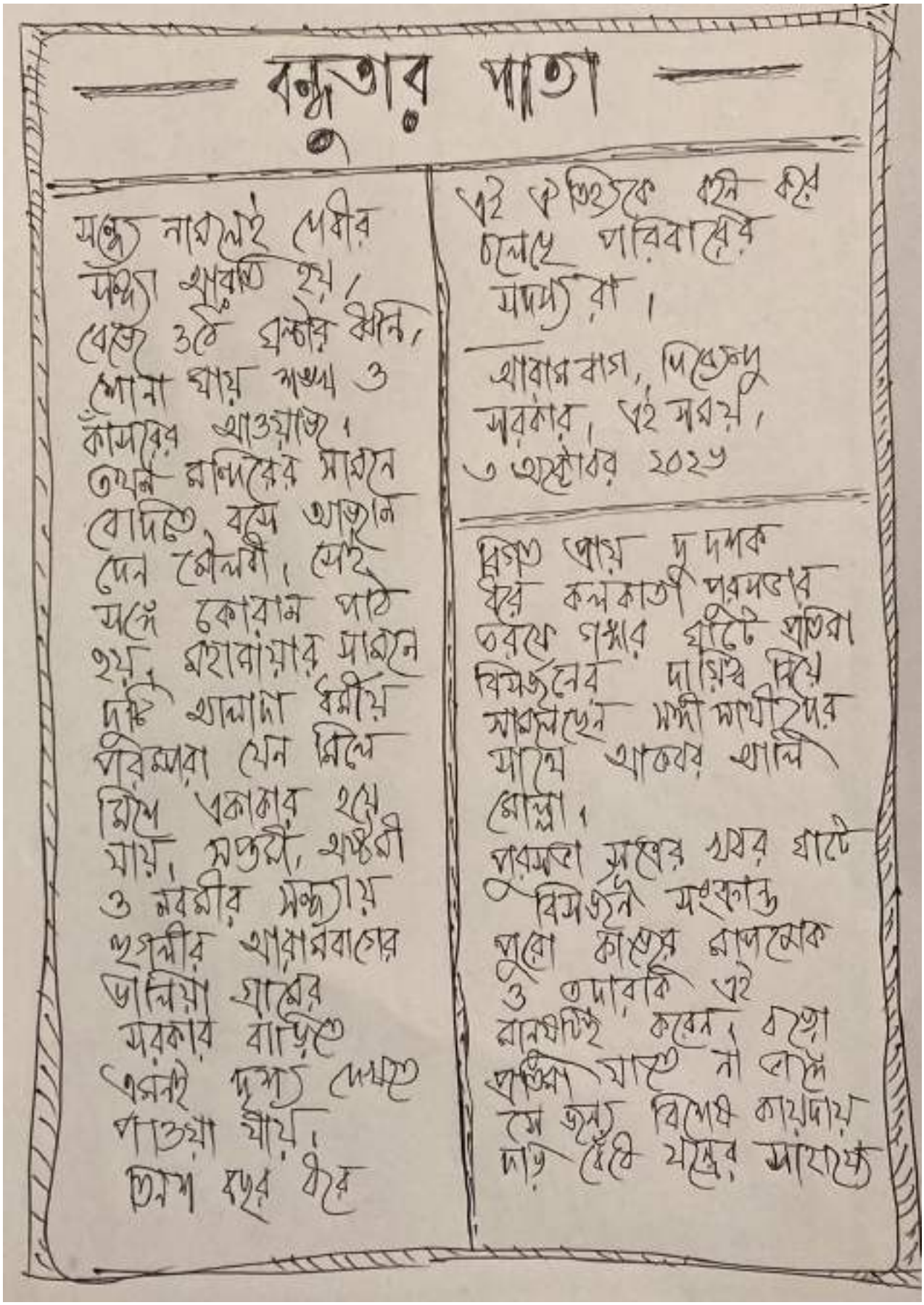

বন্ধুতার পাতা

সন্ধ্যে নামলেই দেবীর সন্ধ্যা আরতি হয়, বেজে ওঠে ঘন্টার ধ্বনি, শোনা যায় শঙ্খ ও কাঁসরের আওয়াজ। তখন মন্দিরের সামনে বেদিতে বসে আজান দেন মৌলবী। সেই সঙ্গে কোরান পাঠ হয়। মহামায়ার সামনে দুটি আলাদা ধর্মীয় পরম্পরা যেন মিলে মিশে একাকার হয়ে যায়। সপ্তমী, অষ্টমী ও নবমীর সন্ধ্যায় হুগলীর আরামবাগের ডালিয়া গ্রামের সরকার বাড়িতে এমনই দৃশ্য দেখতে পাওয়া যায়। তিনশ বছর ধরে এই ঐতিহ্যকে বহন করে চলেছে পরিবারের সদস্যরা।

আরামবাগ, দিব্যেন্দু সরকার, এই সময়, ৩ অক্টোবর ২০২৬

বিগত প্রায় দু দশক ধরে কলকাতা পুরসভার তরফে গঙ্গার ঘাটে প্রতিমা বিসর্জনের দায়িত্ব নিয়ে সামলেছেন সঙ্গী সাথীদের সাথে আকবর আলি মোল্লা।

পুরসভা সূত্রের খবর ঘাটে বিসর্জন সংক্রান্ত পুরো কাজের মাপজোক ও তদারকি এই মানুষটিই করেন। বড়ো প্রতিমা যাতে না ভাঙ্গে সে জন্য বিশেষ কায়দায় দড়ি বেঁধে যন্ত্রের সাহায্যে

জলে নামতেন আকবররা। তার নিজের কথায় ওই দাড়িটা আমি ছাড়া আর একজন শুধু বাঁধতে পারে।

এবার ভাসানের পর গঙ্গায় তাকে নামতে হয়েছে। রাতভর ৩৫-৪০ জন শ্রমিক নিয়ে কাঠামো, ফুল, বেলপাতা তুলে মাটি সাফ করতে হয়েছে। ভাসানের কাজে সাধারণ শ্রমিকরা যখন আর পেরে ওঠেন না, তখন শেষ ভরসা হিসেবে জলে নামতে হয় আকবরকেই।

পুরসভার প্রায় সব শীর্ষকর্তাই তাকে চেনেন, ভরসা করেন। বিসর্জনের কাজে তার অভিজ্ঞতা থেকে আকবর বলছিলেন — কী রকম পদ্ধতিতে প্রতিমা নামানো হচ্ছে, জল থেকে কাঠামো তোলা হচ্ছে প্রতিমা যাতে না ভাঙে — সবটাই আমি আর আমার লোকজন দেখি। ২২ বছর ধরে কাদা জলে ঘেঁটে তিনি যে সহজ সত্যিটা বুঝেছেন তার ধার কোনও তত্ত্বকথার থেকে কম নয়।

মুসলিম বলো আর হিন্দু বলো, সবাই সবার দেখভালে চলে। কেউ বলতে পারবে না আমি একাই সব।

প্রতিমা গড়ার কথা মনে করিয়ে করিয়ে পঞ্চম শ্লোক পর্যন্ত পড়া আকবরের সহজ প্রশ্ন: আজকে ক'যে ঠাকুরটা বানানো হচ্ছে বাঁশ কার বাগানের, কে কেটে আনছে, কে বেচছে — কে আর সে খোঁজ রাখে?

আনন্দবাজার পত্রিকা
২৬ অক্টোবর ২০২৬

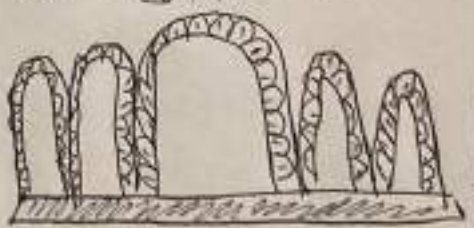

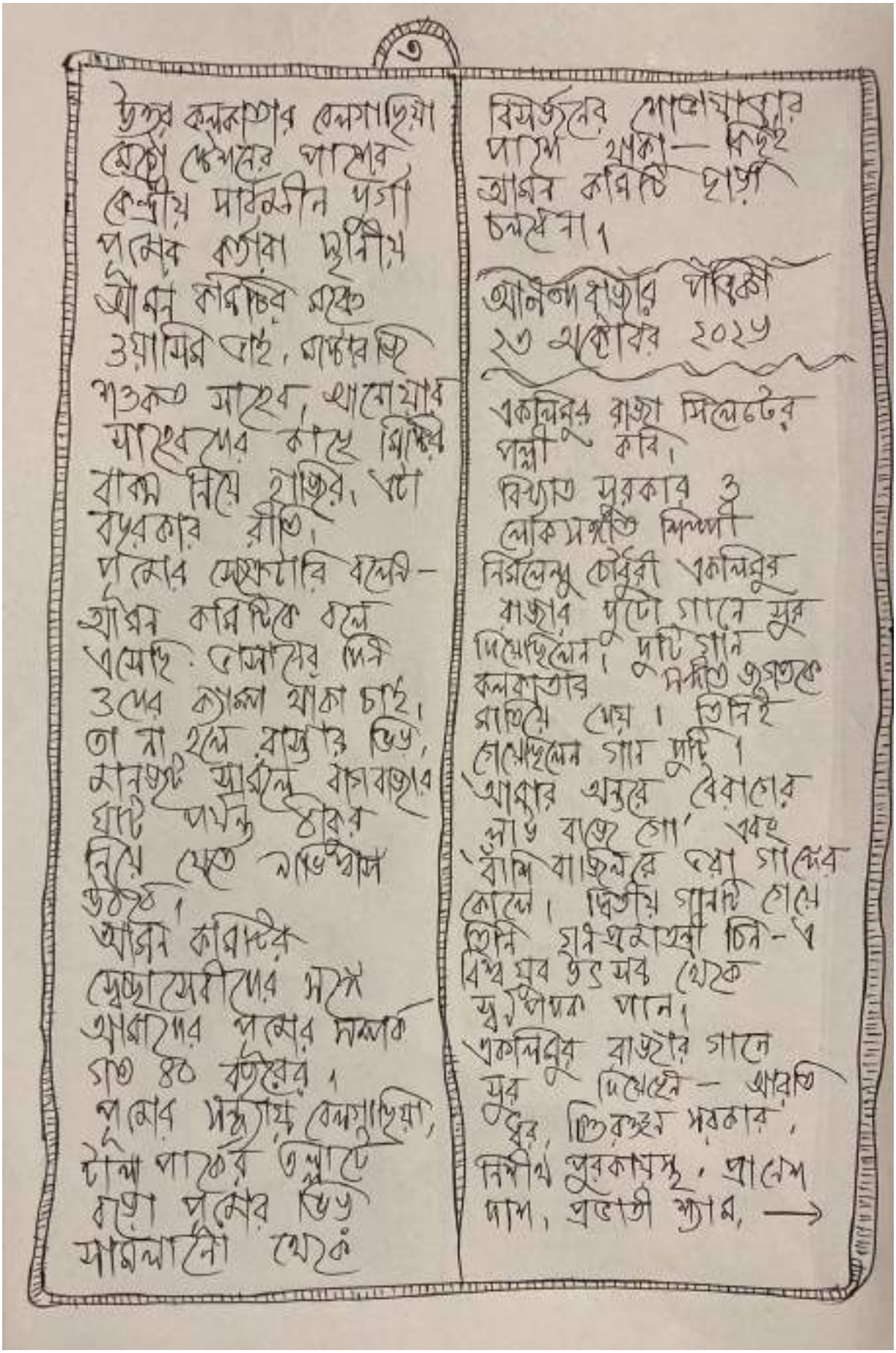

৩

উত্তর কলকাতার বেলগাছিয়া মেট্রো স্টেশনের পাশের কেন্দ্রীয় সবিনয় দর্শা পুলের কর্তারা দুপিসিয় আরন কারিচির রক্ষে ওয়াসির তাই, মাস্টারজি শওকত সাহেব, থানেযার সাহেবদের কাছে মিষ্টির বাক্স নিয়ে হাজির। এটা বড়দরকার রীতি। পুলের সেক্রেটারি বলেছি- আরন কারিচিকে বলে এসেছি। তাদের দিকে ওদের নজর থাকা চাই। তা না হলে রাস্তার ভিড়, মানুষই আরেক বাসরাস্তার ঘাট অবধি ঠাকুর নিয়ে যেতে নাভিশ্বাস উঠবে।

আরন কারিচির স্বেচ্ছাসেবীদের সঙ্গে আমাদের পুলের সদস্য গড় ৪০ বছরের।

পুলের সন্ধ্যায় বেলগাছিয়া টালা পার্কের উল্টোদিকে বড়ো পুলের ভিড় সামলানো থেকে বিসর্জনের শোভাযাত্রার পাশে থাকা— কিছুই আরন কারিচি দ্বারা চলছিল।

আনন্দবাজার পত্রিকা
২৩ অক্টোবর ২০২৫

একলিঙ্গুর রাজা সিলেটের পল্লী কবি।
বিখ্যাত সুরকার ও লোকসঙ্গীত শিল্পী নিরলেন্দু চৌধুরী একলিঙ্গুর রাজার দুটো গানে সুর দিয়েছিলেন। দুটি গান কলকাতার সঙ্গীত অনুরাগীদের মাতিয়ে দেয়। তিনিই গেয়েছিলেন গান দুটি।
'আবার এসব বেলাশেষে লাউ বাজে গো' এবং 'বাঁশি বাজিল রে ওরা গাঙের কোলে'। দ্বিতীয় গানটি গেয়ে তিনি হাইথনাথ্রা চিন-ও বিশ্ব যুব উৎসব থেকে স্বর্ণপদক পান।
একলিঙ্গুর রাজার গানে সুর দিয়েছেন— আরতি মুখার্জি, শিবরঞ্জন সরকার, নির্মীয় সুরকারস্থ, প্রাবেশ দাশ, প্রভাতী শ্যাম, →

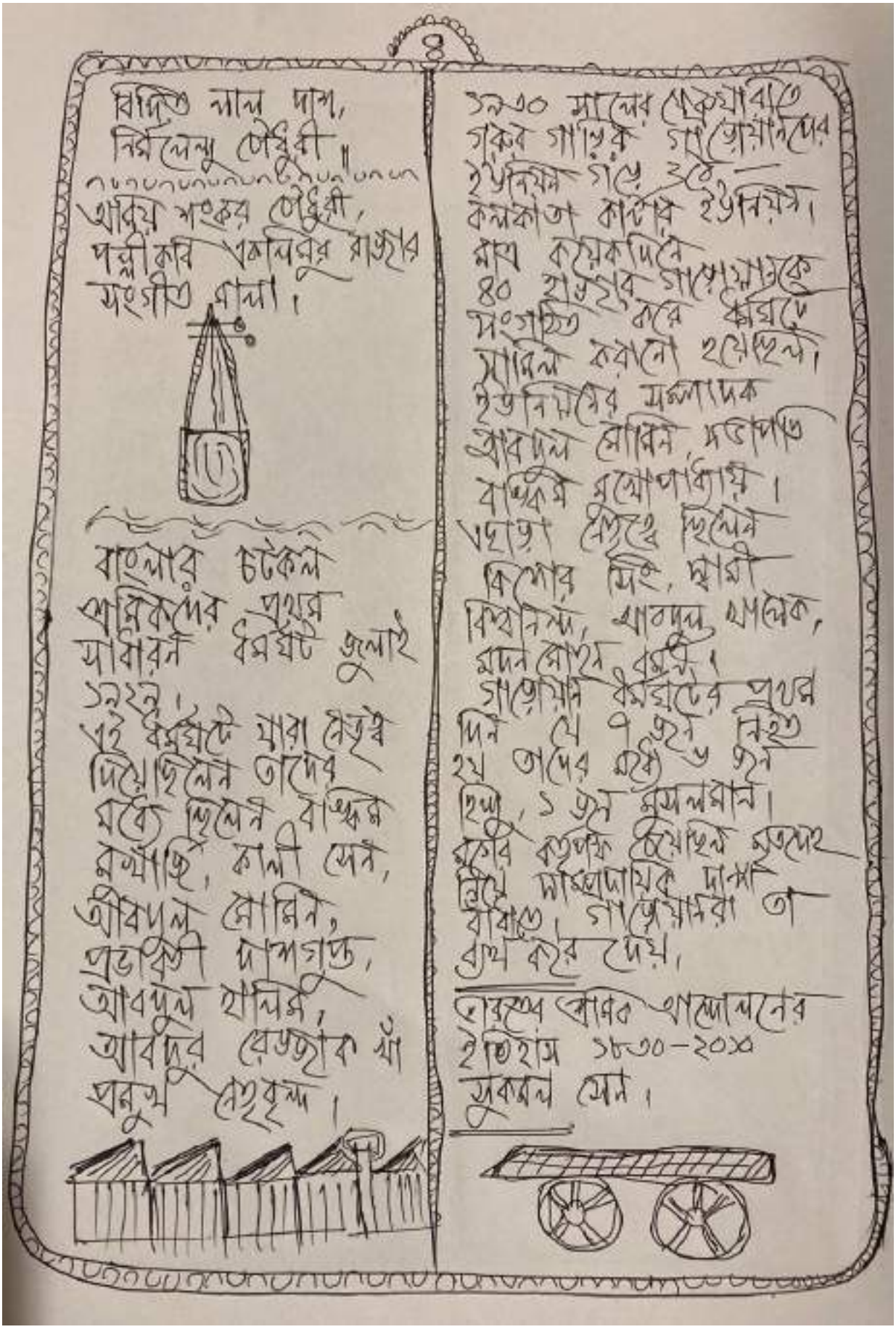

৪

বিদিত লাল দাশ,
নির্মলেন্দু চৌধুরী॥

অমিয় শংকর চৌধুরী,
পল্লীকবি একলিমুর রাজার
সংগীত মালা।

বাংলার চটকল
শ্রমিকদের প্রথম
সাধারণ ধর্মঘট জুলাই
১৯২৯।
এই ধর্মঘটে যারা নেতৃত্ব
দিয়েছিলেন তাদের
মধ্যে ছিলেন বঙ্কিম
মুখার্জি, কালী সেন,
আবদুল মোমিন,
প্রভাবতী দাশগুপ্ত,
আবদুল হালিম,
আবদুর রেজ্জাক খাঁ
প্রমুখ নেতৃবৃন্দ।

১৯৩০ সালের ফেব্রুয়ারিতে
গরুর গাড়ির গাড়োয়ানদের
ইউনিয়ন গড়ে ওঠে —
কলকাতা কার্টার ইউনিয়ন।
মাত্র কয়েকদিনে
৪০ হাজার গাড়োয়ানকে
সংগঠিত করে ধর্মঘটে
সামিল করানো হয়েছিল।
ইউনিয়নের সম্পাদক
আবদুল মোমিন, সভাপতি
বঙ্কিম মুখোপাধ্যায়।
এছাড়া নেতৃত্বে ছিলেন
কিশোর সিং, স্বামী
বিশ্বানন্দ, আবদুল খালেক,
মদন মোহন বর্মন।
গাড়োয়ান ধর্মঘটের প্রথম
দিন যে ৭ জন নিহত
হয় তাদের মধ্যে ৬ জন
হিন্দু, ১ জন মুসলমান।
মৃতের কর্তৃপক্ষ চেয়েছিল মৃতদেহ
নিয়ে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা
বাধাতে। গাড়োয়ানরা তা
ব্যর্থ করে দেয়।

ভারতের শ্রমিক আন্দোলনের
ইতিহাস ১৮৩০–২০১০
সুকমল সেন।